পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি

ধর্ম্মব্যাখ্যা।

১ম খণ্ড।

ধর্ম্মের প্রয়োজন।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক।

কলিকাতা;

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেশিন প্রেসে শ্রী গণেশচন্দ্র
দাস দ্বারা মুদ্রিত এবং ঐ ঠিকানায় শ্রীভূধর
চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

শক ১৮০৬।

মূল্য সাড়ে চারি আনা।

পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি

কৃত

ধর্ম্মব্যাখ্যা।

১ম খণ্ড।

ধর্ম্মের প্রয়োজন।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক।

কলিকাতা;

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী মেশিন প্রেসে শ্রীরমেশচন্দ্র
দাস দ্বারা মুদ্রিত এবং ঐ ঠিকানায় শ্রীভূধর
চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

শক ১৮০৬।

বিজ্ঞাপন।

বহুদিন পরে বুঝি আবার ভারতের দুঃখ পূর্ণ ভাগ্য প্রসন্ন হইল। আবার বুঝি ভারতগগনে পবিত্র সুধাকরের নির্ম্মল জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। বহুযুগ ধরিয়া নিদ্রাভিভূত ভারত-সন্তান, আর্য্য-সন্তান পুনরায় দেখি চক্ষুরুন্মীলন করিতেছেন। আপনাদের প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত হৃদয় বাঁধিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা আবার ভারতবাসীর পরম সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে। পুনরায় আর্য্যসন্তানের হৃদয়ে প্রবল ধর্ম্মানুরাগ, উদ্যম, ও উৎসাহ অল্পে অল্পে সঞ্চারিত হইতেছে দেখিয়া কার প্রাণ আনন্দে না মাতিয়া উঠে। আজ চারি মাস ধরিয়া যে তুমুল ধর্ম্মান্দোলনে ভারতবর্ষ আলোড়িত হইল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আপনাদের সমূহ ক্ষতি স্বীকারে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া, ঝড় বৃষ্টি ভ্রূক্ষেপ করিয়া নিশ্চল ভাবে জনতা মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, উৎসুকচিত্তে যে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির অমৃতময়ী, জ্ঞানপূর্ণ, সারগর্ভ ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিল, ইহা দেখিয়া কোন ধর্ম্মানুরাগীর হৃদয়ে আশার সঞ্চার না হয়? বর্ত্তমান সময়ে ভারতসন্ততিগণ এই পবিত্র অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুভব করিতে কতদূর সমর্থ হইবেন তাহা জানি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় বিশ্বাস যে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা ইহার আশানুরূপ শুভ ফল সম্ভোগ করিয়া আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন ইহাতে কোন মাত্র সংশয় নাই। কিন্তু এই আন্দোলন স্থায়ীরূপে রক্ষিত করিতে হইলে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বিবৃত ব্যাখ্যা সমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ তাহা হইলে ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই স্থিরচিত্তে শান্তভাবে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ধর্ম্মানুশীলন করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে বিশেষ সুবিধা হইবে। নচেৎ যদি এই ঘোর আন্দোলন কেবলমাত্র বক্তৃতাদিতেই পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে অচিরেই ইহা অতীতের কাল গর্ভে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আমি পণ্ডিতবরের সমস্ত ব্যাখ্যা তাঁহার অনুমত্যনুসারে ক্রমে ক্রমে খণ্ডাকারে প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। তিনি স্বয়ং অনুগ্রহ

করিয়া তাঁহার সমস্ত বক্তৃতা বিশদরূপে পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত করিয়া লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তদনুযায়ী এবারে কেবলমাত্র “ধর্ম্মের প্রয়োজন” এই বিষয়টী তাঁহার দ্বারা পরিস্কাররূপে লিখিত হইলে প্রকাশিত করা হইল। বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর। কিন্তু সাধারণের নিতান্ত আগ্রহের নিমিত্ত অতি সত্বর লিখিত হইল বলিয়া অনেকগুলি অংশ সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে তন্নিমিত্ত সে বিষয়গুলি কিছু কঠিন হইবার সম্ভাবনা। ভরসা করি পাঠকগণ একটু নিবিষ্ট চিত্তে লেখকের উদ্দেশ্য সংগ্রহ করিতে যত্নবান হইবেন। ভবিষ্যতে পুনঃমুদ্রণের সময় সে গুলি আরও বিশদরূপে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায়, বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

বশম্বদ
শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায
প্রকাশক।

ওঁ

শ্রীসদাশিবঃ

শরণম্।

ধর্ম্মব্যাখ্যা।

ধর্ম্মের প্রয়োজন।

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনোমে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্, আবিরাবীর্ম্ম এধি, বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতম্মে মাপ্রহাসী রনেনাধীতে নাহোরাত্রান্ সন্দধামি, ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ, হরিঃ, ওঁ ॥

দুঃখের কথা।

কালিদাস, বরাহ, মিহির প্রভৃতি জ্বলন্ত তারাগুলির অস্তকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষের উন্নতির আভ্যন্তরিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয় যে, আজকাল ভারতবর্ষ স্থূল-জড়তত্ত্ব-জ্ঞানবিষয়িণী-উন্নতির দিকে তীব্রবেগে ধাবিত হইতেছে। সহস্রাধিক বৎসরের পর ভারতবর্ষে এরূপ জ্ঞানচর্চ্চার পুনরভ্যুদয়, অনাবৃষ্টি পরিশুষ্কদেশে নববর্ষণের ন্যায়, নিতান্ত আহ্লাদজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অতিশয় পরিতাপের বিষয় এই যে, যে পরিমাণে আমাদের

স্থূলজড়পদার্থের জ্ঞান উন্নত হইতেছে, সূক্ষ্মতত্ত্বের জ্ঞান সেই পরিমাণেই ক্ষীণ ও মলিন হইয়া আসিতেছে; স্থূল জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সূক্ষ্মদর্শন শক্তির হ্রাস হইয়া যাইতেছে; জ্ঞান স্থূলভাব ধারণ করিতেছে। এখন চিন্তাশক্তির গতি স্থূলাভিমুখী; স্থূলভাবকে অবলম্বন করিয়াই চিন্তা পর্য্যবসিত হইতেছে; স্থূলই মনের বিশ্রাম-গৃহ, মন এখন স্থূল বিষয় ব্যতীত আর কিছুই জানিতে চায় না, কোন সূক্ষ্ম বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই যেন মস্তিষ্ক ও মন নিতান্ত কাতর ও ম্লান হইয়া পড়ে, সুতরাং সূক্ষ্মচিন্তা বিরক্তিজনক ও পরিহার্য্য বলিয়া বোধ হয়। অতএব এ উন্নতি আমাদের প্রকৃত উন্নতি বা কল্যাণসাধক বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। ইহা পক্ষাঘাত রোগের ন্যায় মনের একাঙ্গ ক্ষীণ ও ক্রিয়াশক্তি-বিহীন করিয়া অপরার্দ্ধের পুষ্টি সাধন করিতেছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে স্থূল এবং সূক্ষ্ম এতদুভয়বিধ চিন্তাই মনের অঙ্গদ্বয়। এই উভয় চিন্তার বিষয়ও বিভিন্ন প্রকার। স্থূল চিন্তার বিষয় ভৌতিক জগৎ, সূক্ষ্ম চিন্তার বিষয় অধ্যাত্ম জগৎ, আবার উভয় চিন্তার ফলও পৃথকবিধ। ভৌতিক চিন্তার ফল ভৌতিক জগতে, অধ্যাত্ম চিন্তার ফল অধ্যাত্ম জগতে। অর্থাৎ শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার প্রকৃত কল্যাণসাধনই অধ্যাত্মচিন্তার মুখ্য ফল। কিন্তু দুর্ভাগ্য সমাজ সেই অধ্যাত্ম চিন্তায়ই সম্পূর্ণ উদাসীন। যাহার তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত, যে আত্মার সন্তোষ উপহারের নিমিত্ত, জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত এত আয়াস, এত পরিশ্রম, এত অপমান, এত গ্লানি স্বীকার, সেই আত্মার বিষয় চিন্তা,—সেই অধ্যাত্ম জগতের চিন্তাই সমাজের উপেক্ষিত বিষয় হইয়াছে! এই নিমিত্তই সমাজের ঈদৃশ দুরবস্থা, নানাপ্রকার আধি ব্যাধি দ্বারা সমাজ প্রপীড়িত; সুখ, শান্তি, স্বচ্ছন্দতা সমাজ হইতে বিলুপ্তপ্রায়;—ভারতসমাজ হাহাকারে পরিপূর্ণ!

যত দিন উভয়বিধ চিন্তাশক্তির গতি সমসূত্রে উন্নতির দিকে প্রবাহিত না হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত কল্যাণ কদাচ সম্ভাবিত নহে। অধ্যাত্ম জগতে চিন্তনীয় বিষয়ের মধ্যে 'ধর্ম্ম' একটী মুখ্যতম বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এই মুখ্য বিষয়টীতেই সমাজের যাদৃশ অবহেলা পরিলক্ষিত হয়, এমন আর কোনটীতেই নয়।

দেশীয় শিক্ষার অভাব হইয়া কেবল বিদেশীয় শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মন ও মস্তিষ্ক বিদেশীয় ভাব, বিদেশীয়-সংস্কার, বিদেশীয় দৃষ্টি ও বিদেশীয় প্রকৃতি দ্বারা সংগঠিত হইয়া উঠিয়াছে;—এমন কি ভারতীয় মনুষ্যের পৃথক্ অস্তিত্বই বিলুপ্তপ্রায়! আজ ভারতবর্ষ মৃত, আজ আৰ্য্যভূমি ভারতবর্ষকে, উপইংলণ্ড বা ফিরিঙ্গিল্যাণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি বোধ হয় না। আজ নব্যসমাজ, ভারতবর্ষে যাহা কিছু দেখেন, তাহাই বিদেশীয় দৃষ্টিদ্বারা; যাহা কিছু ভাবেন তাহা বিদেশীয় ভাবনাদ্বারা; এবং যাহা কিছু ধারণা করেন, তাহাও বিদেশীয় ধারণা দ্বারা। তাই বলি, আৰ্য্যভূমি ভারতবর্ষ, উপ-ইংলণ্ড হইয়া উঠিল! তাই বলিয়াই, আজ অন্য দেশের পুঁতুলপূজা 'আইডোলেটরি,' আমাদের বহুমূল্য সগুণ ব্রহ্মোপাসনাও 'পৌত্তলিকতা,' অন্যদেশে ব্যবসায়াদি ভেদে 'কাষ্টসিষ্টেম্,' আমাদেরও প্রাকৃত জাতিভেদ 'কাষ্টসিষ্টেম্'। আজ অন্য দেশের ধৰ্ম্ম কেবল সমাজের অঙ্গমাত্র, কারণ তাহার মূল ভিত্তিস্বরূপ যে ৮।১০টি আজ্ঞা আছে, তাহা কেবল সমাজের নিমিত্তই আবশ্যক; সেইহেতু ভারতের অমূল্য ধৰ্ম্ম-ধনও সামাজিক অঙ্গমাত্র। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন নিয়মেই এইরূপ বিপরীত ভাব প্রবেশ করিয়াছে।

নব্যসমাজের অবস্থা বলিলাম। আবার আজ কালের প্রাচীন-সমাজের অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রাচীনসমাজ স্থূল, সূক্ষ্ম কোনও চিন্তার আবশ্যকতা মনে করেন না। তাঁহারা যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহাই করিবেন। আৰ্য্যশাস্ত্রের নিৰ্ম্মল সুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গুলি যে তাঁহাদের ঘোর স্বেচ্ছাচার ও স্বার্থপরতায় বিমিশ্রিত হইয়া, এখন নিতান্ত মলিনবেশে পরিণত ও ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা প্রাচীনসমাজ ঈষৎ কটাক্ষ করিয়াও দেখেন না। প্রাচীন-সমাজ স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চিন্ত ও অচল অটল। এইরূপে, কি নব্যসমাজ কি প্রাচীনসমাজ, উভয়ত্রই ধৰ্ম্মের শোচনীয় অবস্থা।

ধৰ্ম্ম কাল্পনিক পদার্থ নহে।

আজিকাল কেহ কেহ এমনও মনে করেন, ধৰ্ম্ম এক প্রকার কাল্পনিক জিনিস, ইহা কবির মনের এক প্রকার ভাব মাত্র—ইহার উপর দেশের

প্রকৃত শুভাশুভ নির্ভর করে না—সুতরাং ইহার নিমিত্ত এত প্রয়াস, এত ত্যাগ-স্বীকার অপ্রয়োজন। বাস্তবিক তাহা নিতান্ত ভ্রম। ধর্ম্ম আমাদের প্রকৃতির সহিত,—অস্তিত্বের সহিত গাঁথা। ভারতীয় ধর্ম্মের কোন অংশে কল্পনার অণুমাত্র চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। উহার প্রত্যেক সিদ্ধান্তই ভারতীয় প্রকৃতির অনুমোদিত। ভারতের আচার-ধর্ম্ম, ভারতের ব্যবহার-ধর্ম্ম, ভারতের আহার-ধর্ম্ম, ভারতের উপাসনা-ধর্ম্ম, ভারতের ব্রত-ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই ভারতের স্বভাবের সঙ্গে গাঁথা; এই নিমিত্তই নানা প্রকার গুরুতর বিঘ্ন বাধা পাইয়াও সহস্র সহস্র বৎসরে ইহার অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় নাই। আর্য্যধর্ম্ম যদি কাল্পনিক হইত, তবে কদাচ এত যুগ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিত না। আমরা ইতিহাস দ্বারা অবগত আছি, অনেক অনেক কাল্পনিক ধর্ম্মের চিহ্নও লক্ষিত হয় না; কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্ম নিজ বীর্য্য প্রভাব দ্বারা অদ্যাপি সজীব রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও যে একবারে বিনষ্ট হইবে, ইহা কদাচ মনে করা যায় না। তবে যদি ভারতীয় প্রকৃতি একবারে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, দেশীয় প্রকৃতির সহিত মানবীয় প্রকৃতির সম্বন্ধ যদি একেবারে বিশ্লিষ্ট হয়, তবে দেশোচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের উচ্ছেদ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তাহা কি কখন সম্ভব?

ধর্ম্মের লক্ষণ।

ভারতীয় ধর্ম্ম এইরূপ প্রাকৃতিক পদার্থ বলিয়াই, খৃষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম বা অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ইহার কোন বিশেষ সংজ্ঞা নাই। আমাদের ধর্ম্ম,—শাস্ত্রে কেবল ধর্ম্ম নামেই অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম্ম শব্দের সাধারণত যে বৈয়াকরণ অর্থ বুঝি, আর্য্য-ধর্ম্মস্থলে তাহাই বুঝিতে হইবে।

"ধৃঙ"—অবস্থানে, এই ধাতুর উত্তর "মন্" প্রত্যয় দ্বারা ধর্ম্মপদ সাধিত। যাহার জন্য বস্তুর অবস্থিতি এবং যাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না,—যাহা বস্তুর প্রকৃতি স্বরূপ, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। আমাদের ধর্ম্মও সেইরূপ। যে গুণ-বিশেষ সূক্ষ্ম বীজভাবে থাকাতে আমরা মনুষ্য, যে সূক্ষ্ম-গুণ-বিশেষের বিনাশে মনুষ্যত্বের হানি, যে সূক্ষ্ম-গুণ-বিশেষ

না থাকিলে আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, সেই সূক্ষ্ম গুণ-বিশেষই আমাদের ধর্ম্ম।

সেই সত্ত্বগুণ-সম্ভূত গুণ-বিশেষ একই পদার্থ; কার্য্যকারণ ভেদে নানা প্রকারে পরিণত হয়। বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই এক শক্তি হইতেই * বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম বিকাশিত হইয়া আত্মাতে সঞ্চিত হয়। যজ্ঞ দ্বারা একরূপ ধর্ম্ম সঞ্চিত হয়, শ্রাদ্ধ দ্বারা একরূপ, ব্রতদ্বারা একরূপ, অতিথি সেবা দ্বারা একরূপ এবং উপাসনা দ্বারা একরূপ ধর্ম্ম বিকাশিত হইয়া সঞ্চিত হয়। বাস্তবিক সমস্ত ধর্ম্মেরই মূলবীজ—মূল প্রকৃতি একটী মাত্র শক্তিবিশেষ। অতএব উপাসনাদিসাধ্য সমস্ত ধর্ম্মের মূল বীজ বলিয়া তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

প্রথম দেখা যাউক, সেই বীজভূত ধর্ম্মটি কি?—আত্মার যে শক্তি বিশেষের দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি প্রভৃতির চঞ্চলতা এবং বাহ্য বিষয়াভিমুখে গতি বা বাহ্য বিষয়ে পরিচালনা নিরুদ্ধ হইয়া নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় উহাদের স্থিরতা সম্পাদিত হয়, সেই শক্তিই সমস্ত ধর্ম্মের বীজভূত ধর্ম্ম। এই শক্তিটীর নাম 'নিরোধশক্তি।' জল সেচনাদিকারণ দ্বারা যেরূপ বৃক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যজ্ঞব্রতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা এই নিরোধশক্তি হইতেই বহুবিধ ধর্ম্ম বিকাশিত হয়। † তাহাদের নাম কার্য্য ধর্ম্ম—'

---

* ননু কথমত্র একমেব বস্তু কচিদ্গুণঃ কচিচ্ছক্তি রিত্যাখ্যায়তে? নৈয়ায়িক নয়ে গুণ শক্ত্যোর্ভেদাৎ। উচ্যতে অত্র প্রাচীন দর্শন মত মবলম্ব্য এবমুক্তম্, তেহি শক্তি গুণয়োরভেদং পশ্যন্তি।

অলমতি বিস্তরেণ।

† কি প্রকারে নিরোধ শক্তি হইতেই সমস্ত ধর্ম্ম বিকাশিত হয়, তাহা অতি বিস্তার ভয়ে এখানে বলিলাম না। আমার অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান নামক গ্রন্থে ইহা বিস্তার মতে ব্যাখ্যাত হইবে। ভরসা করি, কেবল এ স্থানটিতে কোন সন্দেহ হইলে সুবুদ্ধি পাঠকমাত্রেই আমার অধ্যাত্ম বিজ্ঞান প্রকাশের প্রতীক্ষা করিবেন।

অধর্ম্মের লক্ষণ।

আত্মার আর একটী শক্তি বা গুণবিশেষ আছে, সেই শক্তিবিশেষের দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়,* মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি, বাহ্য বিষয়ে পরিচালিত হয়—দর্শন ও শ্রবণাদির নিমিত্ত প্রেরিত হয়, এই শক্তি বিশেষের নাম 'ব্যুত্থান শক্তি।' ধর্ম্ম শব্দের যোগার্থ দ্বারা ইহাকেও আত্মার ধর্ম্ম বলা যায়। কিন্তু নানা প্রকার নিষিদ্ধ অনুষ্ঠান দ্বারা এই ব্যুত্থান শক্তি হইতেই কতকগুলি অনির্ব্বচনীয় পাপ, এবং ঈর্ষ্যা, অসূয়া, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি পাপ বা কুৎসিত গুণ সমুৎপন্ন হয়, আর এই গুণগুলি কেবল মনুষ্যেই থাকে না, পশ্বাদির আত্মাতেও থাকে, সুতরাং ব্যুত্থান শক্তি সমুৎপন্ন গুণগুলি সাধারণ প্রাণীরই ধর্ম্ম। এ নিমিত্ত ব্যুত্থান শক্তিকে বীজভূত অধর্ম্ম, আর তাহা হইতে উৎপন্ন গুণগুলিকে অধর্ম্ম (অপধর্ম্ম) বলা যায়। †

এই নিরোধশক্তি আর ব্যুত্থানশক্তি যে চিত্তের ধর্ম্ম এবং ইহাদের যে লক্ষণ বলা হইল তাহা পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে। ‡

---

* ইন্দ্রিয় বলিলে চক্ষু কর্ণাদির আকৃতি মাত্র বুঝায় না, কিন্তু চক্ষু কর্ণাদির অন্তর্গত যে শক্তি বিশেষ আছে, যদ্দ্বারা দেখা যায় এবং শুনা যায় সেই শক্তি বিশেষের নাম ইন্দ্রিয়।

† যে প্রকারে ব্যুত্থান শক্তি হইতে অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তাহাও আমার 'অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে' ব্যাখ্যাত হইবে।

‡ এই কথাটি এখানে তত গুরুতর প্রয়োজনীয় নয় বলিয়া সূত্র কয়েকটি মূল মধ্যে নিবেশিত হইল না।

"ব্যুত্থান নিরোধ সংস্কারয়োর—ভিভব প্রাদুর্ভাবৌ নিরোধ ক্ষণ চিত্তান্বয়ো নিরোধ পরিণামঃ" এই নবম সূত্র অবধি "এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্ম লক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ" এই ১৩শ সূত্র পর্য্যন্ত এবং 'ব্যুত্থান সংস্কারাশ্চিত্ত ধর্ম্মা ঃ—নিরোধ সংস্কারা অপি চিত্তধর্ম্মাঃ" ইত্যাদি ভাষ্য দ্বারা ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ধর্ম্মের বর্ণনা।

নিরোধশক্তি হইতে সমুৎপন্ন ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে, এমত অসংখ্য প্রকার ধর্ম্ম আছে, যাহার বিশেষ বিশেষ নাম নাই, শাস্ত্রে কেবল সেই গুলিকে "অপূর্ব্ব" মাত্রই বলিয়াছেন; সুতরাং তাহার এক একটী লইয়া কার্য্য প্রণালী দেখান নিতান্ত সুকঠিন। এ নিমিত্ত যে ধর্ম্ম গুলির বিশেষ বিশেষ নাম আছে, তাহাই লইয়া আমরা বিশেষ আলোচনা করিব। ফলতঃ ইহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলিও দর্শিত হইবে। সেই ধর্ম্মগুলি এই;—

১ম ধৃতি, (ধারণা করা স্মরণ রাখিবার শক্তি) *; (২) ক্ষমা, (কেহ অপকার করিলে যে তাহার প্রত্যপকারে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিকে যে শক্তি দ্বারা নিরোধ করা যায়); (৩) দম, (শোক, তাপাদি দ্বারা কোন প্রকার চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইলে, যে শক্তি দ্বারা ঐ প্রবৃত্তির নিরোধ করা যায়); (৪) অস্তেয়, (অবিধি পূর্ব্বক পরস্ব গ্রহণের প্রবৃত্তিকে যে শক্তিদ্বারা নিরুদ্ধ করা যায়); (৫) শৌচ, (শরীর ও চিত্তের নির্ম্মলভাব) (৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, (যে শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করা যায়); (৭) ধী, (শাস্ত্রাদি দ্বারা বস্তুর তত্ত্ব নিশ্চয় শক্তি—ধীশক্তি); (৮) বিদ্যা, (যে শক্তি দ্বারা অন্তরস্থ চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মার আন্তরিক প্রত্যক্ষ করা যায়, শরীরাদি হইতে আপনাকে পৃথক্‌রূপে জানা যায়,

---

* কোন একটী মাত্র বিষয় দেখিয়া বা শুনিয়া সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিবৃত্ত হয় না, দর্শন জন্য পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের তাদৃশী গতি কিঞ্চিৎ কালের জন্য নিরোধ করিলে, ঐ দর্শন বা শ্রবণ ক্রিয়া জনিত একটী সংস্কার—বা মনোমধ্যে যে একটী রেখা অঙ্কিত হয়, অর্থাৎ যদ্দ্বারা ঐ দর্শন বা শ্রবণ ক্রিয়াটি পুনর্ব্বার স্মৃতিরূপে মনে উপস্থিত হইতে পারে, সেই শক্তিটির নাম ধৃতি।

কেহ কেহ ধৈর্য্যকেই ধৃতি বলিতে চাহেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রম। যে ধৈর্য্যকে তাঁহারা ধৃতি বলিতে চাহেন, সেই ধৈর্য্য পরোক্ত দম শক্তি ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি শক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত সুতরাং এখানে আবার ধৈর্য্য অর্থ করিলে মনুর পুনরুক্তি দোষ ঘটে।

যে শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অভিমান প্রভৃতি অন্তরস্থ পদার্থ সকল আম্র ও কাঁটালের রসাস্বাদের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্‌রূপে জাজ্জল্যমান মানসিক প্রত্যক্ষ করিতে পারে); (৯) সত্য, (কায় মন ও বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণ যথার্থ আচরণ করা); (১০) অক্রোধ, (যে শক্তি দ্বারা ক্রোধকে নিরুদ্ধ করা যায়)—এই দশটী এবং বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, সন্তোষ প্রভৃতি কতকগুলি সৎগুণ।

এতৎ সমস্তের মধ্যে আত্মবোধের ক্ষমতাটিই সর্ব্বোচ্চ পরম ধর্ম্ম *। কারণ এই ধর্ম্মটীর স্ফুরণ হইলেই মনুষ্যের উন্নতি চরমাবস্থা হয়, মনুষ্য কৃতকার্য্য হয়। এজন্য এইটীই মনুষ্যের সর্ব্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। উক্ত দশটী ধর্ম্ম হইতে ক্রমে বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের উৎপত্তি, তন্নিমিত্ত অনেক স্থানে এই দশটীরই গণনা দেখা যায়। ভগবান মনু বলিয়াছেন ৬ষ্ঠ অং ৯১ ৯২-৯৩-৯৪ শ্লোকঃ—

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ॥
ধৃতিঃ ক্ষমা, দমো স্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।
দশলক্ষণানি ধর্ম্মস্য যে বিপ্রাঃ সমধীয়তে।
অধীত্যচানুবর্ত্তন্তে তে যান্তি পরমাঙ্গতিম্॥
দশলক্ষণকং ধর্ম্ম মনুতিষ্ঠন্ সমাহিতঃ।
বেদান্তং বিধিবচ্ছ্রুত্বা সংন্যসেদনৃণোদ্বিজঃ॥ †

---

* ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"অয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্যোগেনাত্মদর্শনম্" যোগ দ্বারা আত্মার দর্শন করাই পরম ধর্ম্ম॥

† কুল্লূকভট্ট ব্যাখ্যা।—চতুর্ভিরিত্যাদি। এতৈব্র্রহ্মচার্য্যাদিভিরাশ্রমিভিশ্চতুর্ভিরপি দ্বিজাতিভিঃ বক্ষ্যমাণো দশবিধ স্বরূপোধর্ম্মঃ প্রযত্নতঃ সতত মনুষ্ঠেয়ঃ॥ তমেব স্বরূপতঃ সঙ্খ্যাদিভিশ্চ দর্শয়তি ধৃতিরিতি, সন্তোষোধৃতিঃ,

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনবাসী, ভিক্ষুক এই চার আশ্রমী দ্বিজাতিরাই একান্ত যত্নসহকারে দশবিধ ধর্ম্মের সতত সেবা করিবেন। যথা ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধীশক্তি, আত্মজ্ঞান, যথার্থ ভাব, অক্রোধ, এ দশটীই ধর্ম্মের স্বরূপ। যে ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মের এ দশটী স্বরূপ অবগত হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমাগতি প্রাপ্ত হন—আত্মাকে লাভ করেন। এই দশ স্বরূপ ধর্ম্মকে অতি সমাহিত হইয়া অনুষ্ঠান করিতে করিতে দ্বিজগণ সংন্যাসী হইবেন। এখন বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে যে নিরোধ শক্তিকে ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, সেটি কেবল কারণ ধর্ম্ম মাত্র। আর এই যে দশবিধ ধর্ম্ম, ভক্তি বিরাগ সন্তোষাদি ধর্ম্ম এবং কেবল "অপূর্ব্ব" নামক ধর্ম্ম এই তিন প্রকার ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করা হইল, ইহারা কার্য্য-ধর্ম্ম। এই কারণধর্ম্ম ও কার্য্যধর্ম্মের বীজ কেবল মনুষ্যেতেই

পরেণাপকারে কৃতে তস্য প্রত্যপকারানাচরণং ক্ষমা, বিকার হেতু বিষয় সন্নিধানেপি অবিক্রিয়ত্বং মনসোদমঃ, মনসোদমনং দমইতি সনন্দ-বচনাৎ শীতাতপাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা দমইতি গোবিন্দরাজঃ। অন্যায়েন পর-ধনাদি গ্রহণং স্তেয়ং তদ্ভিন্ন মস্তেয়ং, যথা শাস্ত্রং—মৃজ্জলাভ্যাং দেহশোধনং শৌচম্, বিষয়েভ্য শ্চক্ষুরাদি বারণমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ, শাস্ত্রাদি তত্ত্বজ্ঞানং ধীঃ। আত্মজ্ঞানং বিদ্যা। যথার্থাভিধানং সত্যং ক্রোধ হেতৌ সত্যপি ক্রোধানুৎ-পত্তির ক্রোধঃ। এতদ্দশবিধং ধর্ম্মস্বরূপং॥

দশলক্ষণেতি। যে বিপ্রা এতানি দশবিধ ধর্ম্মস্বরূপাণি পঠন্তি পঠিত্বা চাত্মজ্ঞান সাচিব্যেনানুতিষ্ঠন্তে তে ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎকর্ষাৎ পরমাঙ্গতিং মোক্ষলক্ষণাংপ্রাপ্নুবন্তি॥ দশলক্ষণেতি। উক্ত দশ লক্ষণকন্ধর্ম্মং সংযত-মনাঃ সন্ননুতিষ্ঠন উপনিষদাদ্যর্থং গৃহস্থাবস্থায়াং যথোক্তাধ্যয়ন ধর্ম্মান গুরু মুখাদবগম্য পরিশোধিত দেবাদি ঋণত্রয়ঃ সংন্যাস মনুতিষ্ঠেৎ॥

অত্র কৃত্যাদি ব্যাখ্যায়াং নভট্টৈন বয়মেকবচসো ভবিতুমর্হামঃ। নহ্য-বস্থানার্থকস্য ধৃতেঃ সন্তোষার্থকত্বমুপপদ্যতে, অপিতু সবিশেষণাবস্থিতিরেব। তথাহি মনসশ্চাঞ্চল্য নিরোধেন আলস্য স্মৃতিসংস্কাররূপেণাবস্থিতে রহুকুর ব্যাপার বিশেষ রূপা ধারণৈব ধৃতিরুচ্যতে, যথা প্রত্যপকারানা-

থাকে অন্য কোন প্রাণীতে ইহার কিছুই নাই—এই গুণগুলি আছে বলিয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব; এই গুণরাশি দ্বারাই মনুষ্য অন্য প্রাণী অপেক্ষায় পৃথক্, এই গুণসমষ্টি দ্বারাই মনুষ্য শরীর মনুষ্যাকারে পরিণত; এই গুণরাশি দ্বারাই মনুষ্য অন্য প্রাণী অপেক্ষায় পৃথক্, এই গুণগুলি না থাকিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না, এই গুণগুলির হ্রাস হইলেই মনুষ্যত্বের হ্রাস এবং ইহারই উন্নতি হইলে মনুষ্যত্বের উন্নতি। এ নিমিত্ত এই গুণগুলির নাম মনুষ্যের 'ধর্ম্ম'।

ধর্ম্মের অবস্থা।

উক্ত ধর্ম্ম আর অধর্ম্মের দ্বিবিধ অবস্থা আছে। এক, বিকাশিত অবস্থা; আর এক লীন অবস্থা। যখন ইহাদের বিকাশিত অবস্থা হয়,

---

চরণাদি রূপাভাবানাম্ ক্ষমাদিত্বম্ অভাবস্যা নুষ্টেয় ত্বা সম্ভবাৎ, নবা দেহ-শুদ্ধি মাত্রং শৌচং মনঃশুদ্ধেরেব লক্ষ্যত্বস্য যুক্তত্বাৎ॥

"ধৃতিক্ষমাদির ব্যাখ্যায় আমরা কুল্লুকভট্টের মতে একবাক্য হইতে পারিলাম না। ভট্ট বলেন,—"ধৃতি (সন্তোষ) ক্ষমা, (অপকারক ব্যক্তির প্রত্যপকার না করা। দম, (বিষয়সংসর্গসত্ত্বেও মনের বিকার না হওয়া) অস্তেয়, (অন্যায় পূর্ব্বক পরধন অপহরণ না করা) শৌচ, (মৃত্তিকাও জল দ্বারা দেহশোধন) অক্রোধ, (ক্রোধকারণসত্ত্বেও ক্রোধ না করা)।" আমরা এই অর্থ সুযুক্তিসঙ্গত মনে করি না। কারণ অবস্থান অর্থের 'ধৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন ধৃতি শব্দের 'সন্তোষ' অর্থ নিতান্ত অসংলগ্ন, আবার অপকারক ব্যক্তির প্রত্যপকার না করা অর্থাৎ অপকারক ব্যক্তির প্রত্যপকার করণের অভাবকে 'ক্ষমা' বলিলেন ইহাও নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয়। কারণ 'ক্ষমা' মনের একটী বৃত্তি হওয়া আবশ্যক উহা মনের একটী বৃত্তিবিশেষ না হইয়া 'অভাব' পদার্থ হইলে কদাচ অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না। 'দম' প্রভৃতিতেও এই একই দোষ। আবার মনঃশুদ্ধিই যখন সকল শাস্ত্রের একতম মুখ্য উদ্দেশ্য তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেহ ধৌত করাকে 'শৌচ' বলাও যুক্তিবিরুদ্ধই বোধ হইল।

তখন ইহাদের নাম 'প্রবৃত্তি' বা 'বৃত্তি', আর যখন লীন অবস্থা হয়, তখন তাহার নাম 'সংস্কার'।

এতদুভয়ের বিশেষ এই;—ধর্ম্মাধর্ম্মের বিকাশ অবস্থার কার্য্য সুস্পষ্ট-রূপে দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সংস্কার অবস্থার কার্য্য অতি সূক্ষ্ম, এনিমিত্ত তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না; হয়ত, সময়ে সময়ে কিছু মাত্রই অনুভবে আসে না।

মনে করুন, ভক্তি একটী ধর্ম্ম। ইহা যখন মনোমধ্যে বিকাশিত হয়, তখন শরীর মধ্যেই ইহার কার্য্য বিলক্ষণরূপে অনুভূত হয়। আবার যখন ঐ ভক্তির ভাবটী মনোমধ্যে বিলীন হয়, তখন আর কিছুমাত্র অনুভব হয় না। আরও দেখুন, ক্রোধ একটী অধর্ম্ম, ইহা যখন মনো-মধ্যে বিকাশিত হয়, তখন চক্ষুদ্বয়ের রক্তিমাকার ও ফুস্‌ফুসাদির বেগবত্তা বিলক্ষণরূপ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যখন ঐ ক্রোধ বৃত্তিটী বিলীন হয়, তখন তাহার কিছুমাত্র অনুভব হয় না।

ইহার তাৎপর্য্য এই;—যখন দেখি বালককালের মুখস্থ করা 'ক' 'খ' বা কত শত গদ্য পদ্য এখনও মনে আসে, যাহা একবার দেখিয়াছি, যাহা একবার শুনিয়াছি, যাহা একবার ভাবিয়াছি, সমস্তই মনে আসে, উদ্দীপনার কারণ মাত্র পাইলেই ঠিক স্মরণ হয়; তখন ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় যে, আমাদের মনে যত প্রকার প্রবৃত্তির বিকাশ হয়, তাহার কোনটীই একেবারে বিনষ্ট হয় না। কিন্তু কেবল সাম্যভাবেই মনোমধ্যে অবস্থিতি করে। যদি মনের ক্রিয়া বিকাশিত হইয়া একেবারেই বিনষ্ট হইত, তবে আমরা সহস্র সহস্র চেষ্টা দ্বারাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনা সকল মনে করিতে পারিতাম না। কিন্তু, মনের ক্রিয়ার নিয়ম এই যে, ঠিক একই সময়ে ভিন্ন প্রকারের দুইটী ভাব মনোমধ্যে বিকাশিত হয় না। কোন দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়া হইতে হইতে যদি অন্য আর একটি দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়া আসিয়া মনে উপস্থিত হয়, তখন এই শেষের ক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বেকার দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়াটী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। তখন শেষে দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়াটীই মনের উপর আধিপত্য করিয়া বিকাশিত হয়। এইপ্রকারেই

আমাদের মনে দর্শন বা স্পর্শনাদি সমস্ত ক্রিয়ার উদ্দীপনা হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিচ, শেষে দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বকার বিকাশিত দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়াগুলি অত্যন্ত ক্ষীণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হয় সত্য, তথাপি ঐ পূর্ব্বকার দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়াগুলির পুনর্ব্বার বিকাশিত হওয়ার চেষ্টা বিলক্ষণ-রূপ থাকে, পরে সময়মতে একটুকু সুযোগ ও সাহায্য পাইলেই পুনর্ব্বার এক একটী করিয়া মনোমধ্যে পূর্ণবেগে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। ইহারই নাম স্মরণ হওয়া।

মনে করুন আপনি যেন রামদাসকে দেখিতেছেন। তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে আপনার মনোমধ্যে এক প্রকার ক্রিয়ার বিকাশ হইয়াছে এবং ঐ ক্রিয়ার বিকাশ থাকিতে থাকিতেই যেন তখন শ্যাম-দাস আসিয়া সম্মুখস্থ হইল, তখন শ্যামদাসের শরীর হইতে তাহার গৌর-বর্ণাকার-শক্তি বিশেষ প্রসারিত হইয়া আপনার চক্ষুঃ প্রণালী দ্বারা মস্তিকে উন্নীত হইয়া মনের উদ্বোধন করিতে লাগিল। কিন্তু ঠিক এককালে দুই রকমের দুইটী ক্রিয়া মনোমধ্যে বিকাশিত হইতে পারে না বলিয়া অগত্যাই তখন রামদাসের দর্শন ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া অবশেষে অত্যন্ত ক্ষীণ ও লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল। তখন শ্যাম-দাসের দর্শন ক্রিয়ার উত্তমরূপ বিকাশ হইল—তখন আপনি শ্যামদাসকে দেখিতে লাগিলেন। আবার শ্যামদাসকে দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণদাস আসিয়া উপস্থিত। তখন আবার পূর্ব্বের ন্যায় শ্যামদাসের দর্শন-ক্রিয়াকে ক্ষীণ ও বিলুপ্ত প্রায় করিয়া কৃষ্ণদাসেরই দর্শন ক্রিয়া মনোমধ্যে বিকাশিত হইবে। কিন্তু ঐ পূর্ব্ব পূর্ব্ব দর্শনের ক্রিয়া সকল বিনষ্টপ্রায় ও ক্ষীণাবস্থ হইয়াও পুনর্ব্বার আপনার আপনার উদ্দীপনের চেষ্টা হইতে বিরত হয় না। যেরূপ দুইজন মল্লপুরুষ মল্লযুদ্ধ করিতে করিতে একজন অপরজনের নীচস্থ হইয়াও পুনর্ব্বার আপনার উত্থানের চেষ্টা হইতে বিরত না হইয়া সময় মতে একটু ছল পাইলেই উপরিস্থ মল্লকে নীচে ফেলিয়া আপনি উপরে উঠে, মনের ক্রিয়াও সেইরূপ; মনের ক্রিয়াও ক্রিয়ান্তর দ্বারা একবার বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পুনর্ব্বার

সময় মতে বিকাশিত হইয়া উঠে। এই প্রকার দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়ার বিলুপ্ত প্রায়-ক্ষীণাবস্থাকে 'সংস্কার' * অবস্থা বলে।

যেরূপ আমাদের দর্শনাদির জ্ঞান বৃত্তির সংস্কার অবস্থা দেখাইলাম, সেইরূপ আমাদের সকল প্রকার প্রবৃত্তিরই সংস্কার অবস্থা মনে থাকে। কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম সকলেরই সংস্কার অবস্থা আছে। উহারা কেহই বিকাশিত হইয়া একেবারে মূলসহ বিনষ্ট হয় না; মনোমধ্যে সকলেই বিলুপ্তপ্রায় ক্ষীণাবস্থায় থাকে। ইহা কার্য্য দ্বারা সপ্রমাণ হয়। যখন যজ্ঞ দ্বারা, পূজা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, উপাসনা দ্বারা এক একটী কেবল 'অপূর্ব্ব' নামে সদ্গুণ বা ধর্ম্ম আমাদের মনোমধ্যে বিকাশিত হয়; অথবা যখন আমাদের মনে ধৃতি, ক্ষমা, দম, বিবেক, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম বিরাগ ইত্যাদি ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বিকাশ হয়; কিম্বা যখন ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, হিংসা, কামের তৃষ্ণা ইত্যাদি অধর্ম্ম বৃত্তির উদয় হয়, তখন উহারাও পরে পরে উৎপন্ন এক একটী বৃত্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া বিলুপ্ত-প্রায় ক্ষীণাবস্থায় (সংস্কারাবস্থায়) মনে থাকে। কিন্তু যখন পুনর্ব্বার উপযুক্ত উদ্দীপনার কারণের সহায়তা পায় তখনই ঐ সকল বিলুপ্তপ্রায় প্রবৃত্তি গুলি বায়ু সাহায্যে তৃণাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় প্রবল বেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ইহার প্রণালী এই;—মনে করুন, যেন আপনার মনো-মধ্যে ক্রোধ প্রবৃত্তি বিজৃম্ভিত হইয়া স্নায়ু মণ্ডলকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। কিন্তু ক্ষণৈক পরে যাহার উপর আপনার ক্রোধ, সেই ভৃত্য আসিয়া কর-যোড়ে নতশিরে ভয়ভরে দাঁড়াইল। তখন অবশ্যই আপনার মনে দয়াবৃত্তির বিকাশ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঠিক একই সময়ে ভিন্ন রকম দুইটী ক্রিয়া মনে হইবে না, সুতরাং তখন অগত্যাই দয়া দ্বারা ক্রোধবৃত্তি সংযত হইয়া বিনষ্টপ্রায় ক্ষীণাবস্থায় আত্মাতেই থাকিল। কিন্তু উহার পুনর্ব্বার উদ্দীপনের চেষ্টাও থাকিবে, পরে যখন সময় মতে উপযুক্ত উদ্দীপক কারণ পাইবে, তখন আবার ক্রোধবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে। আবার মনে করুন আপনার যেন ভগবানের উপাসনা

* এই জাতীয় সংস্কারকে বাসনা বলে।

করিতে করিতে মনোমধ্যে ভক্তি প্রবৃত্তির বিকাশ হইল, তখন আহ্লাদের আর সীমা নাই, আনন্দের পার নাই, কিন্তু ঐ সময় যেন আপনার শিশু সন্তান আসিয়া ক্রোড়ে বসিল, তখন অবশ্যই সন্তান স্পর্শের জ্ঞান-বৃত্তি আপনার মনে বিকাশিত হইবে, সুতরাং ঐ বৃত্তির উত্তেজনা হইয়া ভক্তিবৃত্তি বিলুপ্তপ্রায় ক্ষীণাবস্থায় মনোমধ্যে থাকিবে। পরে আবার যখন কোন উদ্দীপক কারণের সাহায্য পাইবে, তখন ঐ ভক্তিবৃত্তি পুনঃ পুনঃ উদ্দীপিত হইবে। অথবা যেন বিবেক ধর্ম্মের বিকাশ হইল, তখন আপনি দেখিতে পাইলেন যে, যে মহাশক্তি হইতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে—সেই মহানের মহান্ অনন্ত বল হইতেই আপনার এই ক্ষুদ্র শরীর পরিচালিত। এই অনন্ত জগতে এক ব্যতীত কর্ত্তা নাই, এক ব্যতীত স্বাধীন নাই, এক ব্যতীত দুইও নাই—আপনি আমি কেহই নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যেন কোন্ খান্ হইতে আর একটী বৃত্তি আসিয়া উপস্থিত। তখন ঐ বৃত্তি দ্বারা বিবেক ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইল, বিবেক বৃত্তি বিলুপ্ত প্রায় ক্ষীণাবস্থায় (সংস্কারাবস্থায়) থাকিল। কিন্তু যখন ভবিষ্যতে উদ্দীপক কারণের সাহায্য পাইবে তখনই আবার মনোমধ্যে বিবেক ধর্ম্ম বিকাশিত হইবে।

সকল প্রকার ধর্ম্ম বা অধর্ম্মেরই এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। মনো-বৃত্তি—আত্মার বৃত্তিমাত্রেরই ঐ একই রূপ প্রণালী। ইহা দর্শনের স্থির-তর সিদ্ধান্ত যে, "নাসদুৎপাদোনৃশৃঙ্গবৎ" "নাশঃ কারণ লয়ঃ"—"যাহা নাই, তাহা কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং যাহা আছে তাহাও একবারে শূন্যভাবে বিনষ্ট হয় না। সমস্ত-বস্তু, সমস্ত-শক্তি, সমস্ত-ক্রিয়াই এক একটী মূল বস্তু হইতে, এক একটী মূল শক্তি হইতে বিকাশিত হয় মাত্র—তাহাকেই উৎপত্তি বলে। আর নাশের সময়ও কেবল মাত্র সূক্ষ্মাবস্থায় বিলীন হয়।" (সাঙ্খ্যদর্শন)। সুতরাং আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্মও এক একটি মূল ধর্ম্ম হইতে বিকাশিত হইয়া আবার শূন্য-ভাবে বিনষ্ট না হইয়া সূক্ষ্মভাবে (সংস্কারভাবে) অবস্থিতি করে। যদি আত্মার বৃত্তিগুলি সংস্কার রূপে না থাকিত তবে আমার আমিত্বই থাকিত না, মন থাকিত না, অন্তঃকরণ থাকিত না। কারণ, কেবল-

মাত্র অসংখ্য সংস্কাররাশির উপরেই আমার আমিত্ব, মনের অস্তিত্ব, অন্তঃকরণের সত্ত্বা অবস্থিত। ইহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

ধর্ম্মাধর্ম্মের এই রূপ সংস্কার দার্শনিকগণ স্বীকার করেন। যথা—

পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদের ১৮ সংখ্যক "সংস্কারসাক্ষাৎ করণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্।" এই সূত্রে ভগবান্ বেদব্যাসকৃত ভাষ্য— "দ্বয়ে খল্বমী সংস্কারাঃ স্মৃতি ক্লেশহেতবো বাসনারূপাঃ, বিপাকহেতবো ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাস্তে পূর্ব্বভবাভি সংস্কৃতাঃ পরিণামচেষ্টা নিরোধশক্তি জীবন-শক্তিবদপরিদৃষ্টাঃ চিত্তধর্ম্মাঃ।" ইহার অর্থ এই:—আমাদের মনে যে কোন শক্তি বা ক্রিয়ার বিকাশ হয় তাহা হইতে দ্বিবিধ সংস্কার সঞ্চিত হয়। তন্মধ্যে যে জাতীয় সংস্কারগুলি স্মরণ বা অবিদ্যাদির কারণ তাহাদের নাম বাসনা। আর যে জাতীয় সংস্কারগুলি আমাদের জন্ম, আয়ু ও ভোগের কারণ তাহাদের নাম ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। এই সকল সংস্কারগুলি পূর্ব্বেকার ক্রিয়ার দ্বারা গঠিত হয়। যেমন পরিণামশক্তি, চেষ্টাশক্তি ও জীবনশক্তি প্রভৃতি শক্তিগুলি সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় না তেমনই এই সকল সংস্কারগুলিও সুস্পষ্ট অনুভূত হয় না।

অদৃষ্ট।

মনের এই ভাল মন্দ ক্রিয়াগুলি যখন আমাদের আত্মার মধ্যে সংস্কারাবস্থায় থাকে তখন উহা মনে মনেও অনুভব করা বা দর্শন করা যায় না। কেবলমাত্র যখন কোন উদ্দীপক কারণের সাহায্য পায় তখনই উহা পুনঃ পুনঃ স্ফুরিত হয়, এই দেখিয়া উহাদের সূক্ষ্মরূপে অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এ নিমিত্ত, ঐ সংস্কারাবস্থাপন্ন ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তির নাম 'অদৃষ্ট' বা 'অপূর্ব্ব'। ইহাই ভগবান্ কার্ষ্ণাজিনি বলিয়াছেন, "কর্ম্মণ এবোত্তরাবস্থা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যা পূর্ব্বম্" (বেদান্তদর্শন)। যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা হউক বা গোবধাদি দ্বারা হউক—যে কোন বিহিত বা অবিহিত ক্রিয়া দ্বারা মনোমধ্যে কোন একটী ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে, পরে তাহার যে অবস্থাটী (সংস্কার) মনে থাকে তাহারই নাম ধর্ম্মাধর্ম্ম

স্বরূপ ‘অপূর্ব্ব’ বা ‘অদৃষ্ট।’ তন্মধ্যে যেগুলি কুৎসিত বা কষ্টদায়ক গুণের (অধর্ম্মের) সংস্কার তাহার নাম ‘দুরদৃষ্ট’, আর যেগুলি উন্নতি বা সুখসাধক গুণের (ধর্ম্মের) সংস্কার তাহাদের নাম ‘শুভাদৃষ্ট’। *

পাপ ও পুণ্য।

আমরা ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কারাবস্থা বর্ণনা করিয়া আসিলাম। যে অবস্থাকে ‘অদৃষ্ট’ বা ‘অপূর্ব্ব’ বলা হইয়াছে সেই অবস্থারই নাম ‘পাপ’ ও ‘পুণ্য’। যাহা অধর্ম্মের সংস্কার অবস্থা তাহার নাম ‘পাপ’ আর যাহা ধর্ম্মের সংস্কার অবস্থা তাহার নাম ‘পুণ্য’ অর্থাৎ কুৎসিত বা ঐহিক পারত্রিক ক্লেশদায়ক গুণের সংস্কার অবস্থার নাম ‘পাপ’ আর প্রকৃত সুখ বা ঐহিক পারত্রিক উন্নতিদায়ক সংস্কারগুলির নাম ‘পুণ্য’।

ধর্ম্মাধর্ম্মের গতি প্রণালী।

অধর্ম্ম আর ধর্ম্ম বৃত্তি এতদুভয়ের বিচিত্র ও ভিন্ন প্রকার গতি আছে, ইহাদের উভয়ের ক্রিয়া প্রণালী ঠিক পরস্পরের বিপরীত। অধর্ম্ম প্রবৃত্তির গতি নিম্নাভিমুখে, আর ধর্ম্ম প্রবৃত্তির গতি উর্দ্ধাভিমুখে। অধর্ম্ম প্রবৃত্তি যতই নিম্নাভিমুখ হয় ততই বলবতী। আর ধর্ম্ম প্রবৃত্তি যতই উর্দ্ধাভিমুখ হয় ততই বলবতী। অধর্ম্ম প্রবৃত্তির উদ্দীপন কালে স্নায়ু মণ্ডলের অণুরাশির মধ্যে যে কম্পন বিশেষ উৎপন্ন হয় তাহা বহির্ম্মুখীন, আর ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনা কালে স্নায়ু মণ্ডলের অণুরাশির মধ্যে যে বিকম্পন বিশেষ উৎপন্ন হয় তাহা অন্তর্ম্মুখীন। এ নিমিত্ত অধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে “অধঃস্রোতস্বিনী প্রবৃত্তি,” আর ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে “উর্দ্ধ-

---

* আজ কাল নানাবিধ অমূলক কল্পনা দ্বারা আমাদের ‘অদৃষ্টের’ নিতান্ত দুরবস্থা। যাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় ‘অদৃষ্ট’ কে তিনি তাহাই বলেন। এ নিমিত্ত, নিবেদন এই যে, এই, শাস্ত্র ও যুক্তিমূলক অদৃষ্টের ব্যাখ্যাটি যেন স্মরণ রাখেন। বোধ হয় সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই এইরূপ অদৃষ্ট অবশ্য স্বীকার করিবেন। অদৃষ্টের কার্য্যপ্রণালী ‘পুনর্জ্জন্ম’ প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করিব ইচ্ছা থাকিল।

স্রোতস্বিনী প্রবৃত্তি” বলা যায়। অতএব শিবসংহিতাতে লিখিত আছে, “তেচোর্দ্ধস্রোতসো নিত্যং” ইত্যাদি। যাঁহারা সাধনের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সর্ব্বদা উর্দ্ধ-স্রোতস্বিনী প্রবৃত্তি হয়। অতএব সাঙ্খ্যতত্ত্ব কৌমুদীতে বলিয়াছেন,—

“ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ”

ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা আত্মার উর্দ্ধগতি, আর অধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা আত্মার অধোগতি হইয়া থাকে।

এই কথাটী পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইলে, আর একটী কথা মনে করা আবশ্যক। সেই কথাটী এই ;—“ত্রীণি খলু স্থানানি নিযুজ্যমান শক্তি মাত্রস্যৈব, সূত্র স্থানম্, প্রবাহস্থানম্, নিয়োগ স্থানমিতি”। কার্য্যে প্রবর্ত্তমানশক্তি (ক) মাত্রেরই তিনটী স্থান থাকে—সূত্রস্থান (১), প্রবাহস্থান (২), নিয়োগস্থান (৩)। যেস্থান হইতে কোন শক্তির সমুত্থান হয়, সেখানে তাহার “সূত্রস্থান” (খ), যেখান দিয়া ঐ শক্তিটী প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়, সেখানে তাহার “প্রবাহস্থান” (গ)। আর যেখানে গিয়া ঐ শক্তিটী অন্য বস্তুর সহিত মিলিত হয়, সেখানে তাহার “নিয়োগ-স্থান” (ঘ)। মনে করুন, একটী কাঠের ঘোড়ায় রশী লাগাইয়া একটী বালক টানিতেছে। এখানে, যে আকর্ষণশক্তিটী দ্বারা দারুময় অশ্বটী বালকের দিকে যাইতেছে, সেই শক্তিটী বালকের হস্ত হইতে সমুত্থিত ; এনিমিত্ত বালকের হস্তে ঐ শক্তির “সূত্রস্থান।” পরে ঐ শক্তিটী রশী দ্বারা প্রবাহিত হইতেছে, এ নিমিত্ত ঐ রশীতেই শক্তির “প্রবাহস্থান।” পরে কাষ্ঠময় অশ্বে গিয়া ঐ শক্তির যোগ হইয়াছে, এ নিমিত্ত কাষ্ঠময় অশ্বেই ঐ “শক্তির নিয়োগস্থান।”

এখন জিজ্ঞাস্য, বালকের হস্তের ঐ আকর্ষণ শক্তিটি আবার কোথা হইতে আসিল?—আত্মা বা মনের বাসস্থান মস্তিষ্ক * হইতেই ঐ শক্তি

(ক) (force); (খ) (Intensity); (গ) Direction); (ঘ) Point of application)

* “তা এতাঃ শীর্ষঞ্ছিয়ঃ শ্রিতাশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাক্‌প্রাণঃ” (ঐতরেয়ারণ্যকের ২আং। ১ অং। ৪ খ। ইহার অর্থ—

প্রথমতঃ আসিয়াছে। অতএব ঐ শক্তির প্রথম সূত্রস্থান মনযুক্ত মস্তিষ্ক। তৎপর ঐ শক্তি হস্তের স্নায়ু সমূহ দ্বারা প্রবাহিত হইয়াছে, এ নিমিত্ত উহার প্রথম প্রবাহস্থান স্নায়ুতে। তৎপর ঐ শক্তি হস্তের পেষীর উপর সম্বদ্ধ হইয়া পেশীতে সংলগ্ন হইয়াছে, অতএব বালকের হস্তেই ঐ শক্তির প্রথম নিয়োগস্থান। এখন বুঝিতে পারিলেন যে, বালকের ঐ কাষ্ঠ ঘোটক টানিবার শক্তি প্রথম মস্তিষ্কস্থ মনে স্ফুরিত হইয়া করতলাভিমুখে (অধোভিমুখে) প্রবাহিত হইতেছে। আবার আর এক কথা, ঐ আকর্ষণ বৃত্তিটী করতলাভিমুখে যতই অগ্রসর হয় ততই স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনাদি বশতঃ অধিকতর বলবতী হয়। এবং ইহাও সহজে জানা যায় যে, ঐ আকর্ষণ প্রবৃত্তিটী যখন হস্তাগ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহার পরিচালনা দ্বারা স্নায়ুবীয় অণুসকল অবশ্যই সম্মুখের দিকে ঈষৎ বিকম্পিত হইবে। এই আকর্ষণ বৃত্তিটি অধঃস্রোতস্বিনী। কারণ এই বৃত্তিটি, মস্তক হইতে প্রবাহিত হইয়া হস্তাগ্রের অভিমুখে আসিতেছে।

যেরূপ এই আকর্ষণ বৃত্তিটির অধঃস্রোতস্বিনী গতি ও অন্যান্য অবস্থা বুঝিলেন, তেমন আমাদের দর্শন ও স্পর্শনাদির নিমিত্ত যে সকল মানসিক প্রবৃত্তির স্ফুরণ হয়, তাহাদের প্রত্যেকেরই এইএক নিয়ম। কামাদি প্রবৃত্তিরও এই নিয়ম। ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতি পাপ বৃত্তিরও এই একই নিয়ম। যে কোনরূপ অধর্ম্মের বিকাশ হয় তাহারই এই নিয়মে গতি। মনে করুন, আপনার অপকারক ভৃত্য বুধোকে আঘাত করিবার

চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি, মন, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শক্তি এবং প্রাণ ইহারা মস্তিষ্ক আশ্রয় করিয়া থাকে। (অন্যান্য স্থানেও যে মন প্রাণাদি থাকিবার কথা আছে, তাহার উদ্দেশ্য পৃথক।)

এইখানে আর একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত। পাঠকবর্গ যেন আর্য্যগণের উচ্চারিত মন বা আত্মাকে ইংরাজি মাইণ্ড (mind) বা সোল (soul) শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিয়া বুঝিবেন না। কারণ আর্য্যদের মন আর আত্মা এবং ইংরাজি মাইণ্ড আর সোল—ইহা আমার বিশ্বাসে অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ।

জন্য আপনি উদ্যত। এক্ষণে অবশ্যই আপনার মনে ক্রোধ প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইয়াছে। তখন আপনার হৃদয় ও মুখ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিকম্পিত হইতে লাগিল, রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, চক্ষু আরক্ত হইল, হৃৎপিণ্ডাদি যন্ত্র সকল অতিশয় বেগে নর্ত্তন করিতে লাগিল। এইক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে ক্রোধ একটী বল বিশেষ, একটী শক্তি বিশেষ (ক)। নচেৎ আপনার শরীরে এইরূপ বিকৃতি হইবে কেন? শক্তি ব্যতীত আর কেহই ত জড় বস্তুকে বিকৃত বা পরিচালিত করিতে সমর্থ নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং ক্রোধ একটী বল বিশেষ, এইরূপ সকল প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সকল প্রকার মনোবৃত্তি এক একটী শক্তি বিশেষ তাহার সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাউক, ক্রোধ বৃত্তির উত্তেজনা কালে আপনার শরীরে কিরূপ ঘটনা হইয়াছে?—এক্ষণে, ঐ ক্রোধ নামক বল বিশেষ আপনার মনোমধ্যে বিজৃম্ভিত হইয়া সর্ব্ব শরীরের স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া হস্তাগ্রাদির অভিমুখে আসিতেছে * সুতরাং এই ক্রোধশক্তির গতি, মস্তিষ্ক হইতে নিম্নাভিমুখী হইতেছে। এবং এই ক্রোধ নামক শক্তিটি স্নায়ুমণ্ডল দ্বারা প্রবাহিত হইয়া যতই দেহের বহিঃস্তরে হস্ত পদাদির অগ্রভাগে প্রবাহিত হইতেছে, ততই স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনাদি বশতঃ অধিক বলবতী হইবে। এবং যখন ঐ শক্তিটি বহির্দ্দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখন, অবশ্যই স্নায়ুমণ্ডলের অণুরাশির মধ্যে একটী পরিচালনাও হইতেছে; সেই পরিচালনা অবশ্যই বহির্ম্মুখী, সুতরাং উহাতে যে স্নায়ুর অণুরাশির মধ্যে এক প্রকার কম্পন বিশেষ জন্মিয়াছে, তাহাও বহির্ম্মুখ। অতএব এই ক্রোধ বৃত্তিটী অধঃস্রোতস্বিনী। এবং এই ক্রোধ প্রবৃত্তিটির 'সূত্রস্থান' মনযুক্ত মস্তিষ্কে আর 'প্রবাহস্থান' সর্ব্ব শরীরের স্নায়ু মণ্ডলে, এবং 'নিয়োগস্থান'

(ক) force

* ক্রোধ হস্তাগ্রাভিমুখে আসিতেছে, ইহা শুনিলে সাধারণের আপাততঃ হাসি আসিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক উহা হাসির কথা নহে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিদেরা উহা আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিতে পারেন। আমাদের উপাসনা প্রবন্ধে উহা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইবে।

হাতের মুষ্টিতে, যদ্দ্বারা আপনি বুধোকে আঘাত করিবেন। অপকার্য্য দ্বারা,—নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা আমাদের যে কোনরূপ অধর্ম্ম গুণ বিকাশিত হয়, তাহারই এইরূপ অধঃস্রোতস্বিনী গতি। ঈর্ষা, অসূয়া, প্রভৃতি সকলেরই এই প্রণালীর গতি। এ নিমিত্ত অধর্ম্মশক্তি মাত্রই অধঃস্রোতস্বিনী।

এখন দেখা যাউক, ধর্ম্মবৃত্তি কিপ্রকারে ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী? মনে করুন, উদ্দীপ্ত ক্রোধাবস্থা থাকিতে থাকিতে আপনার দম প্রবৃত্তির (ধর্ম্ম বর্ণনা দেখ) পরিস্ফুরণ হইল। তখন দমপ্রবৃত্তিঃ ইতস্তত বিসর্পিত ক্রোধ বৃত্তিকে সংযত করিতে লাগিল, প্রবহমান ক্রোধকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিল, যেখান হইতে ঐ ক্রোধ প্রবৃত্তি স্ফুরিত হইয়া সমস্ত শরীরে আসিতেছিল, যেন সেই মনোমধ্যে আবার প্রত্যাকৃষ্ট হইতে লাগিল। এখানে অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যদ্দ্বারা প্রবহমান ক্রোধ নামক বলবিশেষ—শক্তিবিশেষ সংহৃত হইল, অবশ্যই তাহা একটী শক্তিবিশেষ —বলবিশেষ হইবেই হইবে। কারণ কোন একটী শক্তি ব্যতীত আর কেহই কোন একটী শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ নহে। এক শক্তিই অপর শক্তির হ্রাস বৃদ্ধিতে সমর্থ। এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে, যে শক্তি (দম) দ্বারা ঐ বহির্দ্দিকে প্রবহমান ক্রোধ নামক বলবিশেষ সংযত হইল, অবশ্যই তাহা ক্রোধবলের বিপরীত মত বলবিশেষও বিপরীত মত কার্য্যকারক হইবে। অর্থাৎ ক্রোধ যেরূপ মনোমধ্যে উত্থিত হইয়া মস্তিকের সাহায্যে স্নায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হওয়া কালীন; যতই বিস্ফুরিত হয়, ততই অধিকতর বলবান হইয়া থাকে এবং যতই বহির্ম্মুখে অগ্রসর হয়, ততই স্নায়ুমণ্ডলের সম্মুখ চাঞ্চল্যবর্দ্ধন করিতে থাকে। 'দম' তাহার বিপরীত কার্য্য করিতেছে। দম শক্তির শরীরাভ্যন্তরে বলাধিক্য, দম শক্তি স্নায়বীয় অণু সকলকে অন্তরভিমুখে বিকম্পিত করে, দমবল অন্তরভিমুখে গতিমান্। এতৎ সম্বন্ধে ঈদৃশ বাগাড়ম্বর অপেক্ষা আন্তরিক অনুভব—মানসিক প্রত্যক্ষই মুখ্যপ্রমাণ। ক্রোধ ও দমাদির স্ফুরণ হইলে মনে মনেই এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। তবে যাহাদের অনুভবের ক্ষমতা নাই, তাহাদের নিমিত্ত কেবল এইরূপ বাহিরের বাগা-

উন্নয়নের প্রয়োজন। যেরূপ দমের ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী গতি পরিদর্শিত হইল, সেইরূপ আমাদের সকল প্রকার ধর্ম্মেরই ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী গতি। যজ্ঞকরণকালীন, উপাসনাকালীন, ব্রতাদিকরণকালীন যে সকল ধর্ম্ম বিকাশিত হয়, তাহাদের সকলেরই এইরূপ গতি। ভক্তির গতি এইরূপ, বিবেকের গতি এইরূপ, বৈরাগ্যের গতি এইরূপ, ধর্ম্মমাত্রেরই এইরূপ ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী গতি। ধর্ম্মের কার্য্য-প্রণালী দেখাইবার সময় ইহা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইবে।

ধর্ম্মের উন্নতি অবনতি।

ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণ, বর্ণনা, অবস্থা, এবং গতিপ্রণালী সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হইল এবং এই ধর্ম্ম যে আমাদের প্রকৃতির সহিত গাঁথা, ধর্ম্মই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি স্বরূপ ইহাও পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে;—

ধর্ম্ম যদি আমাদের মনুষ্যত্বের সহিত গাঁথা, সহজাত শক্তিবিশেষ হইল, তবে তাহার আবার উন্নতি অবনতি কি? এবং উন্নতির চেষ্টাই বা কেন? রক্ষার চেষ্টাই বা কেন? তাহাতো অবশ্যই আমাদের আছে এবং চিরদিন থাকিবে।

অতি সহজজ্ঞানেই এই সন্দেহ মীমাংসিত হইতে পারে। মনে করুন, তড়িদগ্নির ধর্ম্ম তাপ, পাথর-কয়লার অগ্নির ধর্ম্ম তাপ, ঘুঁটের (শুষ্ক গোময়ের) অগ্নির ধর্ম্ম তাপ কি এক প্রকার? না ঐ সকল তাপের অপসারকতা-ধর্ম্মই এক প্রকার? কদাচ নহে, উঁহা অত্যন্ত বিসদৃশ। আবার জলের ধর্ম্ম তরলতা লইলেও, পৌষ মাসের জল আর জ্যৈষ্ঠ মাসের জলও একরূপ তরল নহে, উহার অনেক ন্যূনাতিরেক আছে। যতই শৈত্য ততই তরলতার হ্রাস, যতই শৈত্যের হ্রাস ততই তরলতার বৃদ্ধি। আবার কারণ বিশেষে জলের তরলতা একেবারে বিনষ্ট হইয়া জলও বরফ হইয়া যায়, এবং অগ্নির তাপ ধর্ম্ম, আর তাপের অপসারকতা বিনাশ হইয়া শুধু অঙ্গার মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই অবস্থায় জলও বলা যায় না অগ্নিও বলা যায় না। আমাদের ধর্ম্মেরও ঐ প্রকার বৃদ্ধি হইতে পারে, হ্রাস হইতে পারে, আবার একেবারে

বিনাশও হইতে পারে—যাহা হইলে আমাদের আর মনুষ্যত্বই থাকে না। সুতরাং ধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতি আছে। তাই শাস্ত্র ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত বারম্বার উপদেশ প্রদান করেন। বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মের পরম উন্নতি, আবার নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মের একেবারে বিনাশও হইতে পারে।

প্রাণীর উৎপত্তি।

এক্ষণে দেখা যাউক, কি প্রকারে ধর্ম্ম মনুষ্যের জীবন, কি প্রকারে ধর্ম্ম মনুষ্যের অস্তিত্ব ভিত্তি, কি প্রকারে ধর্ম্ম আছে বলিয়াই মনুষ্য শরীর মনুষ্যাকারে গঠিত, কি প্রকারে ধর্ম্মের অভাবে মনুষ্যত্বের অভাব এবং কি প্রকারেই বা ধর্ম্মের অভাবে মনুষ্যের শরীরাকার পরিবর্ত্তিত হয়।

যখন দেখা যায়, কি কীট, কি পতঙ্গ, কি পক্ষী, কি পশু, কি মনুষ্য, সকলেরই শরীর সাক্ষাৎ বা পরম্পরারূপে উদ্ভিজ্জের আশ্রিত, সকলেরই শরীর উদ্ভিজ্জীয় পদার্থ দ্বারা সংগঠিত; মূল ধাতু, উপধাতু প্রভৃতি ভূত পদার্থ হইতে উদ্ভিজ্জেরা যে একরূপ পদার্থ সংগ্রহ ও প্রস্তুত করে, সেই পদার্থই মনুষ্যাদি শরীরের মূল ও মুখ্য উপাদান, তাহারই সংগ্রহ করিয়া মনুষ্যাদির শরীর। কেহ বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই উদ্ভিজ্জীয় পদার্থ গ্রহণ করে, কেহ বা পরম্পরা সম্বন্ধে উদ্ভিজ্জীয় পদার্থের সংগ্রহ করে। মনে করুন, উদ্ভিজ্জভোজী শূকর ছাগলাদিরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদ্ভিজ্জ দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন করে, আবার ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুরা সেই মাংস দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, সুতরাং ইহারা পরম্পরা সম্বন্ধে উদ্ভিজ্জীয় পদার্থের গ্রহণ করে। মনুষ্যেরাও উদ্ভিজ্জ ও উদ্ভিজ্জভোজী গোদুগ্ধ ও উদ্ভিজ্জভোজীর মাংসাদি দ্বারা দেহের সংরক্ষণ ও পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে; সুতরাং মনুষ্যেরা সাক্ষাৎ পরম্পরা উভয় রূপেই উদ্ভিজ্জের পদার্থ গ্রহণ করে। বাস্তবিক মনুষ্যাদি কেহই উদ্ভিজ্জ পদার্থ ভিন্ন কেবলমাত্র জল মৃত্তিকাদির পান ভোজন করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না।

আবার যখন দেখি শ্রুতিও বলিতেছেন "অথাতো রেতসঃ সৃষ্টিঃ, প্রজাপতে রেতো দেবা, দেবানাং রেতো বর্ষং, বর্ষস্য রেত ওষধয়ঃ,

ওষধীনাং রেতোঽন্ন, অন্নস্য রেতো রেতো, রেতসোতেঃ প্রজাঃ, প্রজানাং রেতো হৃদয়ং, হৃদয়স্য রেতো মনঃ, মনসো রেতো বাক্"—ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় আরণ্যক (৩ আ—১ অ—৩খ ১ খ।) * * * * বৃষ্টি জলের সারভূত কার্য্য উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিজ্জের সারভূত সৃষ্টি অন্ন—খাদ্য—(উহাদের যে অংশটা অদন (গ্রহন) করিয়া অন্য প্রাণীর পুষ্টি হয়) অন্নের সারভূত সৃষ্টি রেতঃ—বীজ,—(ঠিক যে জিনিষটী দ্বারা শরীর গঠিত হয়) রেতের সারভূত সৃষ্টি প্রাণীর শরীর, শরীরের সারভূত সৃষ্টি হৃদয় (মস্তিষ্ক *), মস্তিষ্কের সারভূত সৃষ্টি বাগিন্দ্রিয়)।

অতএব তখন আমাদের এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়া আসে যে, এই মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী সকল আকাশ হইতে অথবা একেবারে মৃত্তিকাদি পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু উদ্ভিজ্জ হইতেই হইয়াছে। উদ্ভিজ্জই মনুষ্যাদি প্রাণীর সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে পূর্ব্ব মাতা। সকলেই উদ্ভিজ্জ হইতে সমুৎপন্ন। কেহবা একেবারে উদ্ভিজ্জ হইতেই উৎপন্ন, কেহবা আবাব উদ্ভিজ্জজাত প্রাণী হইতে, কেহবা তজ্জাত প্রাণী হইতে উৎপন্ন ইত্যাদি। প্রাণীগণ যদি প্রথম উদ্ভিজ্জ হইতে উৎপন্ন না হইত, তবে উদ্ভিজ্জের পদার্থ ব্যতীতও জীবিত থাকিতে পারিত। কিন্তু তাহা নহে। মৃত্তিকার সহিত ঘটের যেরূপ সম্বন্ধ, উদ্ভিজ্জীয় পদার্থের সহিত ও মনুষ্যাদি প্রাণীর সেই প্রকার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। কারণ উদ্ভিজ্জীয় পদার্থটা বাদ দিলে মনুষ্যাদি শরীরের

---

* যদ্যপি হৃদয় শব্দস্য উরোঽন্তর বর্ত্তিস্থান বিশেষ এব লৌকিক ব্যবহারঃ তথাপি মস্তিষ্কস্যৈব হৃদোমনসো মুখ্যাঽয়ত্বাৎ অত্র মস্তিষ্কমেব হৃদয় শব্দ শ্যবাচ্যম্ তথাচ শ্রুতিঃ "তা এতাঃ শীর্ষঞ্ছিয়ঃ শ্রিত্যশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাক্ প্রাণঃ। (২ আঃ। ১ অং। ৪ খঃ)

লৌকিক ব্যবহারে হৃদয় শব্দে হৃৎপিণ্ডই বুঝায়। কিন্তু শাস্ত্রযুক্তি দেখিতে গেলে হৃদয় শব্দে মস্তিষ্ক বুঝাই উচিত। কারণ 'হৃৎ' শব্দে মন বুঝায় 'অয়' শব্দে স্থান বুঝায়। আবার মস্তিষ্কই মনের স্থান তাহাও শাস্ত্র বলেন। অতএব মস্তিষ্কই এথানে হৃদয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। অতএব উদ্ভিজ্জ হইতেই সাক্ষাৎ পরম্পরা সম্বন্ধে প্রাণীর উৎপত্তি।

প্রাণীর ক্রমোন্নতি।

যখন, আন্তরিক শক্তির পরিবর্ত্তনে গুটিপোকা, উই প্রভৃতির শরীরের অবস্থান্তরে পরিবর্ত্তন দেখি, এমন কি মনুষ্যেরও আন্তরিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বাকৃতি কতকটা পরিবর্ত্তিত লক্ষিত হয়।

যখন দেখি ভগবান্ পতঞ্জলি বলিতেছেন ;—

"জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যা পূরাৎ"

(৪র্থ পাং। ২ সূঃ)

এবং ভগবান্ বেদব্যাস ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন "তত্র কায়েন্দ্রিয়াণামন্য জাতীয় পরিণতানাম্ পূর্ব্ব পরিণামাপায়ে উত্তর পরিণামোপজন স্তেষাং পূর্ব্বাবয়বানু প্রবেশাদ্ভবতি কায়েন্দ্রিয় প্রকৃতয়শ্চ স্বং বিকার মনু গৃহ্নন্তি আপূরেণ ধর্ম্মাদি নিমিত্ত মপেক্ষমাণা ইতি'" অন্য রূপে পরিণত—কোন এক রূপে অবস্থিত শরীর এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্ব জাতীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া আর এক জাতীয় অবস্থা হয়। যখন এরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তখন তাহার পূর্ব্ব শরীরীয় ভৌতিক পদার্থও ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি পরাবস্থায় অনু প্রবিষ্ট হইয়া সাহায্য করে। এই পরিবর্ত্তনের মূল নিমিত্ত আন্তরিক ধর্ম্মাদি। অর্থাৎ মনুষ্যাদি কোন শরীরে অন্য যে কোন জাতীয় ধর্ম্মের স্ফুরণ হয়, শরীরের ভৌতিক পদার্থ রাশিও তখন সেই জাতীয় শরীরই গঠন করিয়া তোলে।

এই সূত্র দ্বারা যে ঠিক ক্রমোন্নতিই বলা হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু ইহাই বলা হইয়াছে যে, যে কোন প্রাণী হউক না কেন তাহারই আন্তরিক ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট রূপ পরিবর্ত্তন হইলেও শরীরাকৃতি অন্য প্রকার উৎকৃষ্টরূপে পরিণত হয়। আবার আন্তরিক ধর্ম্মের অপকৃষ্ট রূপে পরিবর্ত্তন হইলেও শরীরাকৃতি অন্য প্রকার অপকৃষ্ট রূপে পরিণত হয়। সুতরাং এই মত অনুসারে উচ্চ প্রাণী হইতেও অপকৃষ্ট

প্রাণী হইতে পারে, আবার অপকৃষ্ট প্রাণী হইতেও উৎকৃষ্ট প্রাণী হইতে পারে। ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। *

---

* ননু কথমত্র যস্য কস্যচিৎ প্রাণিন এব, জাত্যন্তরপরিণামত্বেন সূত্র ভাষ্যার্থোঽনূদ্যতে? অত্রহি মনুষ্যস্যৈব জাত্যন্তরপরিণামোঽবগম্যতে, "মনুষ্যজাতি-পরিণতানাম্ কায়েন্দ্রিয়াণাং যো দেব তির্য্যগ্ জাতি পরিণামঃ স খলু প্রকৃত্যাপূরাদ্ভবতীতি মিশ্রব্যাখ্যানাত্ 'নিমিত্ত মপ্রযোজক' মিত্যত্র চ নন্দীশ্বরাদীনাং দেবাদি জাতি পরিণামস্যোদাহ্রিয়মাণত্বাৎ, 'তত্র ধ্যানজমনাশয়'মিত্যত্র চ মনুষ্যাণামেব জন্মাদি নির্ম্মাণচিত্তস্য পরিদর্শনাৎ, অন্য নির্ম্মাণচিত্তাপেক্ষয়া মনুষ্যাণামেব সমাধি নির্ম্মাণচিত্তস্য কৈবল্যোপযোগিত্ব পরিদর্শনপ্রকরণাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্নিমিত্ত ত্বস্য ভাষ্যমাণত্বাচ্চ। অত্র প্রত্যুচ্যতে, নাত্র মনুষ্যস্যৈব জাত্যন্তরপরিণতি ব্যাখ্যা যুজ্যতে ভাষ্যকৃদ্ভিরন্যথা ব্যাখ্যানাৎ, এবং হি ভাষ্যং "কায়েন্দ্রিয়াণামন্যজাতীয়পরিণতানামি"তি" নহ্যন্যশব্দস্য মনুষ্যে শক্তিঃ নবা মনুষ্যমাত্র প্রতিপাদনায় অন্যশব্দপ্রয়োগ উন্মত্তবক্তারমৃতে সম্ভবতি তস্মাৎ সামান্যত এব জাত্যন্তর পরিণামোঽবগন্তব্য ইতি। য চ্চাক্তং নন্দীশ্বরাদীনামুদাহরণবলাৎ তথাবগন্তব্যমিতি তদপ্যযুক্তং নহ্যুদাহরণেন নিয়মঃ সঙ্কুচ্যতে নহি "ব্যাধিভ্যোম্রিয়তে যথা দেবদত্ত" ইত্যুক্তে মনুষ্যস্যৈব মৃত্যু কারণং ব্যাধির্নান্যস্যেত্যেবমবগম্যতে, প্রকরণাত্তু নন্দীশ্বরাদয় উদাহৃতাঃ। যচ্চোক্তং মনুষ্যাণামেব পঞ্চবিধনির্ম্মাণচিত্তপরিদর্শনাদিতি, তত্রোচ্যতে সমাধি নির্ম্মাণচিত্তস্যৈব কৈবল্যোপযোগিত্ব প্রতিপাদনায় জন্মাদি নির্ম্মাণচিত্তমুপদর্শিতং নৈতেনান্যস্য জাত্যন্তরপরিণামো নিরাকৃতঃ। নবা প্রকরণসঙ্গতি ক্ষতিঃ গুণপরিবর্ত্তনাজ্জাত্যন্তরপরিণামে মনুষ্যাণামপ্যুদাহরণগর্ভপ্রবেশসম্ভবাৎ, ননু মনুষ্যস্যৈব দেহান্তরিতাদি সিদ্ধি প্রতিপাদনে মনুষ্য দেহস্যৈব জাত্যন্তর পরিণাম প্রক্রিয়ায়া উপোদ্ঘাত সঙ্গতি মত্বাৎ কথমন্যেষামপি জাত্যন্তর পরিণাম প্রতিপাদন প্রসঙ্গঃ? উচ্যতে নান্যেষাং জাত্যন্তর পরিণাম প্রতিপাদনায় এতদারব্ধং অপিতু মনুষ্যস্যৈব, নিয়মস্তু সর্ব্বেষামেব জাত্যন্তর পরিণামং পরিমৃশতীতি। যচ্চোক্তং ধর্ম্মাধর্ম্ম-

অতএব ইহা স্বীকার করা যায় যে, আন্তরিক গুণের পরিবর্ত্তনে শরীরের আকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এবং গুটিপোকাদির ন্যায় কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতে হইতেই প্রাণিজগৎ ক্রমোন্নতি দ্বারা মনুষ্য-জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

ক্রমোন্নতির প্রণালী।

জীবের শক্তি বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে মনুষ্য শরীরে আত্মার শক্তি যত অধিক বিকাশিত এত আর কোন প্রাণীতেই নাই। অন্যান্য প্রাণী শরীরে জীবের শক্তি ক্রমেই অল্প। মনুষ্যাপেক্ষা পশুতে অল্প, পশু অপেক্ষা পক্ষীআদিতে অল্প ইত্যাদি। বাস্তবিক মনুষ্য শরীরই আত্মার সম্পূর্ণ শক্তি বিকাশের উপযুক্ত স্থান। শ্রুতি বলেন 'তাভ্যোগামানয়ৎ

যোনি মিত্তত্ব কথনাৎ মনুষ্যস্যৈব জাত্যন্তরপরিণতি প্রতিপাদক মিদং সূত্রং নহি মনুষ্যমন্তরেণ ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্ভব ইতি তদপ্যযুক্তং নাত্র ধর্ম্মাদিশব্দেন পুণ্যপাপাত্মকাঃ সদসৎপ্রবৃত্তিতৎসংস্কারা উচ্যন্তে অযুক্ত—ত্বাৎ, কিন্তর্হি, জন্মন উৎকর্ষাপকর্ষাপেক্ষয়া শুদ্ধাশুদ্ধস্বরূপ তত্তজ্জাতীয় ধর্ম্মাদিরেব। নহ্যাত্মারামা-দুর্ব্বাসো বামদেবাদয়ো দেবত্বং নাপন্না ইতি দেবানামিন্দ্রাদীনা মপেক্ষয়া হধার্ম্মিকাঃ—কিন্তু দেবধর্ম্মস্যাস্ফুরণাদেব ন দেবদেহ-মাপন্না ইতি।

"জাত্যন্তর পরিণাম" এই সূত্রে মিশ্রব্যাখ্যানুসারে মনুষ্যজাতি হইতেই অন্য জাতির পরিণাম বুঝা যায় এবং আরও পাঁচটী যুক্তি মনে হয় যদ্দ্বারা মনুষ্যেরই জাত্যন্তর পরিণাম বুঝায়। কিন্তু ঐ সমস্ত যুক্তি এবং মিশ্রের ব্যাখ্যা যে নিতান্ত অসঙ্গত ও ভ্রান্তিমূলক তাহা পণ্ডিতগণের বুঝিবার নিমিত্ত সংস্কৃতেই লিখিত হইল, অনেক বিস্তার হয় বলিয়া আর বাঙ্গালায় উহার অনুবাদ করিলাম না, তবে একটী কথা মাত্র অনুবাদ করিতেছি। 'জাত্যন্তর' এই সূত্রে স্বয়ং বেদব্যাস "অন্য জাতীয় পরিণতানাং" যে কোনরূপে পরিণত দেহাদির অন্যাকারে পরিণতি হয় ইহা বলিয়াছেন, তবে বাচস্পতি মিশ্র 'মনুষ্য' শব্দ কোথায় পাইলেন? অন্য জাতীয় বলিলে কি মনুষ্যজাতি বুঝায়?

তা অব্রুবন্ নবৈ নোয়মলমিতি তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ তা অব্রুবন্ নবৈনোয়-মলমিতি তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তা অব্রুবন্ সুকৃতম্বাবতেতি।'— ঐতরেয় উপনিষৎ)। "বিধাতা তাপ. বায়ু, আলোক প্রভৃতির সৃষ্টি করিলে, তাহারা চক্ষুরিন্দ্রিয়াদি শক্তিরূপে পরিণত হইয়া আপন আপন কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত আধার প্রার্থনা করিলে, বিধাতা তাহাদিগকে গবাকার শরীর দিলেন। তাহারা যেন বিধাতাকে বলিল "ইহা আমাদের পর্য্যাপ্তি মতে ক্রিয়ার উপযুক্ত হয় নাই।" পরে বিধাতা অশ্বাকার শরীর উপস্থিত করিলেন তাহাতেও তাহারা ঐরূপ বলিল, পরে পুরুষাকার শরীর উপস্থিত করিলেন তাহাতে তাহারা বলিল 'ইহা আমাদের পর্য্যাপ্ত ক্রিয়ার উপযোগী হইয়াছে।'—ইহা আলঙ্কারিক কথা মাত্র, বাস্তবিক ক্রমোন্নতিই ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয়। আবার ইহাও স্বীকার্য্য যে, একবারে কোন শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। অসম্পূর্ণ ভাব হইতেই ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ ভাব হইয়া থাকে।

অতএব ইহাই সত্য বলিয়া বোধ হয় যে, প্রাণী জগৎ উদ্ভিজ্জ হইতেই ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া এই মনুষ্যরূপে পরিণত হইয়াছে। * অর্থাৎ সম্ভবতঃ উদ্ভিজ্জ হইতে একরূপ পোকা বিশেষ, সেই পোকা হইতে তদপেক্ষা উচ্চ প্রাণী ক্রমে তাহা হইতে তদপেক্ষায় উচ্চ প্রাণী, এই ভাবে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে হইতে পশু, পশুর পরে উল্লুক, বনমানুষ

---

* পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে আমরা এতদ্দ্বারা অদ্ভুত তপোবলসম্পন্ন পূর্ব্বসৃষ্টির দেবর্ষিগণ বা অন্যান্য মহর্ষিগণের যে এই সৃষ্টিতে অদ্ভুত প্রকার উৎপত্তি হইয়া তাঁহাদের হইতেও মনুষ্যাদি সৃষ্টির কথা পুরাণাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহার আমরা নিরাকরণ করিতেছি না। আমরা এখানে কেবল মাত্র, ভগবানের প্রাকৃত নিয়মাধীন যেরূপ সৃষ্টি হইবার নিতান্ত সম্ভব তাহাই ব্যাখ্যা করিলাম।

বাস্তবিক তপোবল দ্বারা যে অদ্ভুত প্রকার সৃষ্টি হইতে পারে তাহা আমাদের শিরোধার্য্য কথা। এবং সেই তপোধন মরীচ্যাদি হইতে সৃষ্টির প্রক্রিয়া আমরা পরে বুঝাইব।

প্রভৃতি, অবশেষে অসভ্য মানুষ, ক্রমে মানুষ। এইরূপেই বোধ হয় জগদ্বিধাতা মানুষকে অবতীর্ণ করিয়াছেন। কীটাদি নীচ প্রাণীর আন্তরিক গুণের পরিবর্ত্তন হইয়া হইয়া গুটিপোকার ন্যায় সশরীরে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের দ্বারা প্রাণি জগৎ মনুষ্যত্বে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ একপ্রাণী একটুক উন্নত ও অবস্থান্তরিত হইয়া মরিয়া গেল, কিন্তু তাহার সন্তান ততটুক উন্নত হইয়াই জন্মিল। পরে তাহার আবার কিছু উন্নতি ও পরিবর্ত্তন হইয়া মৃত্যু হইল কিন্তু তাহার সন্তান ততটুক উন্নত হইয়াই জন্মিল ইত্যাদি ক্রমে উন্নতি হইয়াছে।

আন্তরিক শক্তি দ্বারায় শরীরের গঠন।

যাহাকে আমরা শরীর বা দেহ বলি তাহা কেবল কতকগুলি যন্ত্রের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কি মস্তিষ্ক, কি চক্ষু, কি কর্ণ, কি রসনা, কি নাসিকা, কি ফুস্‌ফুস্‌, কি পাকস্থলী কি মাংসপেশী উহারা সকলেই এক একটি যন্ত্রমাত্র। আত্মাতে যে সকল শক্তি আছে সেই সমস্ত শক্তি বাহ্য বা আন্তরিক বস্তুর সহিত যোগ করিতে হইলেই যন্ত্রের আবশ্যক। যন্ত্র ব্যতীত বিচিত্র রূপে শক্তির নিয়োগ করা সম্ভবে না। তাহাই আমাদের মস্তিষ্ক প্রভৃতি। অর্থাৎ মস্তিষ্ক, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু প্রভৃতি শরীরাবয়ব সকল আর কিছুই করে না কেবল মাত্র আত্মার শক্তি গুলিকে বাহ্য বা আন্তরিক বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়, এই জন্য উহাদিগকে যন্ত্র বলা যায়। তন্নিমিত্তই বানর ও মনুষ্যাদি বিভিন্ন প্রাণীর শরীর এক প্রকারে গঠিত হয় না। কারণ বানরের আত্মার শক্তি ও মনুষ্যের আত্মার শক্তি নিতান্ত বিভিন্ন ও অনেক কমি বেশী সুতরাং বানর ও মনুষ্যাদির শারীরিক যন্ত্রও অনেক বিভিন্ন ও কমবেশী সেই জন্য উঁহাদের শরীর বিভিন্নাকারে গঠিত।

ভগবানের সৃষ্টির প্রক্রিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি বস্তুরাশি সৃষ্টি করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে শক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন সেই শক্তি হইতেই স্থাবর জঙ্গমাদি সকল বস্তুর নানা প্রকার বিচিত্র আকৃতি গঠিত হয়। এখন দেখা যাক্‌ কোন্‌ কোন্‌ শক্তি দ্বারায়

কি ভাবে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় পাদের তের সূত্র এই যে "সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগা" : ইহার অর্থ এই যে, অবিদ্যা ও অস্মিতাদি মূল কারণ থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্মাদির দ্বারায়ই আয়ুর সম্পাদন ও দৈহিক ভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা যখন শুক্র শোণিতের সহিত সংযুক্ত হয় তখন তাহার সংস্কার ভাবাপন্ন ধর্ম্মাধর্ম্মাদি শক্তিগুলি স্ফুরিত ও তৎসঙ্গে সঙ্গে শরীর গঠিত হইতে থাকে। অর্থাৎ বীর্য্যান্তর্গত আত্মাতে প্রথমতঃ (বাসনা নামক) পরিচালক শক্তি, পোষণ শক্তি ও জ্ঞানশক্তির স্ফুরণ হয় * এবং ঐ সকল শক্তি স্ফুরণ হইলে শুক্র মধ্যে তখন তাপ জন্মে। তাপ হইলেই উহার অংশ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হয়। সুতরাং তখন শুক্রাবয়বের ক্ষয় হয়, এবং ক্ষয়ের পর আবার পুষ্টি হয়। ক্ষয় ও পুষ্টি এতদুভয়ের সামঞ্জস্যে ক্রমে শরীরের বৃদ্ধি হইতে থাকে। মনে করুন জরায়ু নিহিত শুক্র মধ্যে আত্মার জ্ঞান শক্তির অধীন দর্শন শক্তির ঈষৎ স্ফুরণ হইল। স্ফুরণ দ্বারা অবশ্যই তাপের উদ্ভূতি হইল সুতরাং ক্ষয়ও হইতে লাগিল। এদিকে ঐ শুক্র মধ্যে ধারণ শক্তির অধীন পোষণ শক্তিও স্ফুরিত, সুতরাং তাহা দ্বারা পুষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমে দর্শন শক্তি যতই স্ফুরিত ও পোষণ শক্তির দ্বারা যতই পুষ্টি হইতে লাগিল ততই এই ক্ষয় ও পুষ্টির সামঞ্জস্য দর্শক স্নায়ুর (ক) অঙ্কুর হয়,—ক্রমেই

---

* ব্যবহারিক জীবাত্মার যে এই ত্রিবিধ শক্তি আছে তাহা সাঙ্খ্যতত্ত্বের ৩২ কারিকায় বলিয়াছেন,—

" করণং ত্রয়োদশ বিধং তদাহরণ ধারণ প্রকাশ করম্।

কার্য্যঞ্চ তস্য দশধা হার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ।

ইহার অর্থ এই,—মন অবধি একাদশেন্দ্রিয়, বুদ্ধি আর অভিমান এই ত্রয়োদশ প্রকার করণ। ইহাদের ক্রিয়া তিন প্রকার,—আহরণ, ধারণ ও প্রকাশন (পরিচালন ক্রিয়া, পোষণ ক্রিয়া, ও জ্ঞান ক্রিয়া)। এই শক্তিত্রয়ের মর্ম্ম ভাবান্তরে কতকটা (সম্পূর্ণ নহে) ব্যক্ত করা যায়। যথা Motive power, Vitality and Sensative power."

(ক) Optic nerve

বিকাশ, বিস্তার ও আকৃতি। এইরূপ এক একটী বৃত্তির স্ফুরণে সেই সেই বৃত্তির পরিচালক স্বরূপ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রের সংগঠন হইয়া ক্রমে একটী পূর্ণ শরীরে পরিণত হইল। এই সময়ে ঈর্ষা, অসুয়া, হিংসা, দ্বেষ, কাম প্রভৃতির সংস্কার গুলি প্রকাশিত। ঐ সকল বৃত্তির উদ্দীপনের স্থান মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ ও অতি সন্নিহিত উর্দ্ধদেশ। সুতরাং ঐ সকল বৃত্তির স্ফুরণে মস্তিষ্কের বেষ্টন গঠন হইতে লাগিল। এই পর্য্যন্ত হইলেই পশুর শরীর সংগঠিত হইতে পারে। পশুর শরীর গঠনের এই শেষ সীমা উহাতে আর কোন শক্তির স্ফুরণের প্রয়োজন হয় না।

মনুষ্য শরীরের উৎপত্তি।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত হইলেই মনুষ্যাকার হইল না। মনুষ্য শরীর হইতে আর কতকগুলি নূতন শক্তি যাহা পশ্বাদি প্রাণীতে নাই তাহার আবশ্যক। সেই শক্তিগুলি অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম ভক্তি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বহুবিধ ধর্ম্ম শক্তির অঙ্কুর বিকাশ হইল। এই সকল শক্তির উদ্দীপনের স্থান মস্তকের উর্দ্ধ ভাগ, সুতরাং ঐ সকল বৃত্তির স্ফুরণ দ্বারা মস্তকের উপরভাগ গঠিত হইল। এই ধর্ম্ম শক্তিগুলি থাকাতে অন্য অন্য শক্তির কিছু কিছু হ্রাসবৃদ্ধি নিবন্ধন শরীরের আকার ঈদৃশ বর্ত্তমান অবস্থায় (মনুষ্যাবস্থায়) পরিণত হয়। পশু কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত শরীরেই এইরূপ আন্তরিক শক্তি স্ফুরণের দ্বারা সংগঠিত হইয়া থাকে। পশুর আন্তরিক শক্তি দ্বারা পাশব শরীর, বানরের আন্তরিক শক্তি দ্বারা বানর শরীর; বনমানুষের আন্তরিক শক্তি দ্বারা বনমানুষীয় শরীর সংগঠিত হয়। আন্তরিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে কিছু কিছু করিয়া শরীর যন্ত্রেরও পরিবর্ত্তন হয়। অর্থাৎ বানরের আন্তরিক ক্রিয়ার যখন কিছু অন্য প্রকার হইল তখন তাহার শরীর যন্ত্রগুলিরও কিছু পরিবর্ত্তন হইল। পরে তাহার সন্তান ঐ আকারের জন্মিল। অনন্তর তাহার আবার আন্তরিক ক্রিয়ার কিছু পরিবর্ত্তন হইল, শরীর কিছু অন্যাকার হইল এবং তাহার সন্তান ঐ নূতন আকারেরই হইল। এই ভাবে হয়ত সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত পরিবর্ত্তন দ্বারা বানর-

হইতে উল্লুক হইল, পরে ঐ রূপে ক্রমে সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত পরিবর্ত্তনে উল্লুক হইতে বনমানুষ হইল। পরে যখন বনমানুষের আত্মায় ধৃতি, ক্ষমা, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তির অতি সূক্ষ্ম বীজ অতি সূক্ষ্মভাবে অঙ্কুরিত হইল তখন উহার শরীরের কিছু পরিবর্ত্তন হইল। ক্রমে হয় ত সহস্র সহস্র বৎসরে অল্পে অল্পে ঐ সকল বৃত্তির অঙ্কুর বৃদ্ধি পাইয়া শত শত পরিবর্ত্তনের দ্বারা যখন ঐ বৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট অবস্থায় আসিল তখন মনুষ্য দেহের আকার হইল।

ধৃতি, ক্ষমা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিবেক, আত্মবোধের ক্ষমতা প্রভৃতি শক্তিগুলি মনুষ্য ব্যতীত আর কোন প্রাণীরই দৃষ্ট হয় না, তবে যে, কোন কোন জাতীয় প্রণীতে ঐ সকল শক্তির দুই একটী মাত্র অতি সামান্য পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাও না থাকারই সমান। কিন্তু মনুষ্যেতে উহা সম্পূর্ণই দৃষ্ট হয় অতএব বুঝিলাম পূর্ব্বোল্লিখিত শক্তিগুলি দ্বারাই মনুষ্যশরীর গঠিত, সুতরাং উহারাই আমাদের ধর্ম্ম, উহারাই আমাদের মনুষ্যাকার দেহের সংরক্ষক ও একমাত্র অবলম্বন। এক্ষণে বুঝিলাম ধর্ম্ম আমাদের প্রকৃতির সহিত গাঁথা, উহা অগ্নির তাপের ন্যায় জলের তরলতার ন্যায় আমাদের সহায়রূপে অবস্থিত।*

---

* এস্থলে বালকগণের সন্দেহ হইতে পারে যে, যখন আত্মার শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পরিবর্ত্তন দর্শিত হইল তখন আত্মা আর শরীরকে একই বলা হইল, বা শরীরেরই শক্তিকে আত্মা বলা হইল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা কদাচ বলা হয় নাই; আত্মা এবং আত্মার শক্তি শরীর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, শরীরের শক্তিও আত্মা নহে। যেমন বিদ্যালয়ের মধ্যে বসিয়া পাঠ কর বলিয়াই তুমি আর বিদ্যালয় এতদুভয় এক নহে সেইরূপ আত্মার শক্তি আর শরীর এক পদার্থ নহে; আত্মার শক্তি সকল শরীর মধ্যে কেবল কার্য্য করে মাত্র। মনুষ্যের শরীর বিনষ্ট হইলে আত্মা বিনষ্ট হয় না, ইহা পুনর্জন্ম প্রকরণে বিস্তাররূপে ব্যাখ্যাত হইবে। এক্ষণে কেবল এই মাত্র স্মরণ রাখিবেন যে আত্মা ও শরীর এতদুভয়কে আমরা নিতান্ত বিভিন্ন বলিয়া জানি।

ধর্ম্মের উন্নতি অবনতির স্বরূপ।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে, যদি ধর্ম্মের স্ফুরণ হইয়াই শরীরের গঠন হইয়া থাকে তবে আর তাহার উন্নতি কি, আর কি প্রকারেই বা অবনতি হইবে?

শরীর গঠনকালে সকল ধর্ম্মের স্ফুরণ হয় না আবার যাহাদিগের স্ফুরণ হয় সেও কেবল অঙ্কুর মাত্র। উহা সম্পূর্ণ বিকাশের অবস্থা নহে। জন্মের পর লব্ধবয়স্ক হইয়া বিহিত অনুষ্ঠান করিলেই ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ অবস্থা হয় সেই পূর্ব্বকার অঙ্কুর সকল শাখাপল্লবাদি দ্বারা পরিশোভিত হয়। আর যদি বিহিত অনুষ্ঠান না করা যায় তবে ঐ অঙ্কুরগুলি ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়। বাস্তবিক ধর্ম্মের অঙ্কুর মাত্র থাকিলেও কোন কার্য্য হয় না। ধর্ম্মশক্তিগুলির যতই বারম্বার অনুশীলন, বারম্বার উদ্দীপন করা হয়, ততই উহারা দৃঢ়তর সংস্কার হইয়া আত্মাতে অবস্থিতি করে। এমন কি, ঐ সংস্কার বলে ভবিষ্যতে কেবল ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিই সর্ব্বদা উত্তেজিত হইতে থাকে। ইহার নাম ধর্ম্মের উন্নতি। আর ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুশীলনে যতই শৈথিল্য ততই উহার উদ্দীপন কম হইবে, ততই উহা ক্রমে ক্রমে বিরল হইবে, এমন কি, ভবিষ্যতে আর সহস্র চেষ্টা দ্বারাও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। কেবল অধর্ম্ম-প্রবৃত্তিরই আধিপত্য। ইহার নাম ধর্ম্মের অবনতি বা ক্ষয়। যে যে উপায়ে ধর্ম্মের উন্নতি ও ক্ষয় হয় তাহা পরে দেখাইব। এক্ষণে দেখা যাউক ধর্ম্মের ক্ষয় ও বৃদ্ধিতে আমাদের কি কি অনিষ্ট ও ইষ্টলাভ হইতে পারে। যে যে অনিষ্ট ও ইষ্টলাভ নিতান্ত স্থূলদর্শী লোকেও বুঝিতে পারেন এবং ভয়ানক নাস্তিকগণও অবশ্য স্বীকার করিবেন সেই সেই দোষগুণগুলি আলোচনা করাই প্রথম আবশ্যক। পরকালের অনিষ্ট ও ইষ্টলাভ পরে বুঝাইব।

ধর্ম্মক্ষয়ে মনুষ্যের অসম্পূর্ণতা ও ধর্ম্মসঞ্চয়ে পূর্ণতা।

ধর্ম্মের ক্ষয় হইলে আমরা অসম্পূর্ণ হই অর্থাৎ আমাদের মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতা থাকে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে একমাত্র ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি

অঙ্কুরিত হওয়াতেই আত্মার মনুষ্যত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। বনমানুষাদির আত্মা অপেক্ষা মনুষ্যাত্মার পার্থক্য হইয়াছে। সুতরাং যে পরিমাণে ঐ সকল ধর্ম্মগুলির হ্রাস হইবে, সেই পরিমাণেই মনুষ্যাত্মার মনুষ্যত্ব কমিবে।* মনুষ্যত্ব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বলের ক্ষয় হইয়া ক্রমে অকর্ম্মণ্যদশা প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ শোক দুঃখ বা ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা কোন প্রবল বাধা আত্মার উপর উপস্থিত হইলে আত্মা তাহা দমন করিতে পারিবে না। বরং ঐ সকল বৃত্তির দ্বারা অতিশয় অভিভূত হইয়া পড়িবে। দেহটী নানা প্রকার ব্যাধির আকর হইবে। কারণ ব্যাধি বিমোচন করিতে হইলে আত্মিরি বলের (ক) প্রয়োজন। কিন্তু অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন অবশ্যই আত্মার বলের হ্রাস হইবে, এইজন্য ব্যাধি বিমোচনে অসমর্থ হইবে, সুতরাং আয়ুরও ক্ষয় হইবে। আর যদি সেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি সমস্তই আত্মাতে বিকাশিত হয়, তবে আত্মার পূর্ণতানিবন্ধন উপযুক্ত কার্য্য ক্ষমতা ও বলিষ্টতা হইবে। আত্মার বলবত্তা থাকিলে শোক দুঃখ বা ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি দ্বারা কিছুমাত্র অভিভূত হয় না। কোন ব্যাধি হইলেও তাহা অনায়াসেই বিমুক্ত হইতে পারে। ব্যাধি বাধা না থাকিলেই সুতরাং আয়ুর বৃদ্ধি।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পশুদিগের আত্মা নিতান্ত অসম্পূর্ণ কারণ তাহাদের কোনরূপ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি আদৌ নাই, তবে তাহারা কেন শোক তাপাদি দ্বারা সর্ব্বদা পরিক্লিষ্ট হয় না? এ আপত্তি নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কারণ পশুদিগের আত্মা মনুষ্যাত্মার তুলনায় নিতান্ত অসম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু তাহাদের পক্ষে তাহাই সম্পূর্ণ। এ নিমিত্ত তাহাদের ওরূপ অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন কোন আধি ব্যাধির পরিপাড়ন হয় না। বল থাকিয় তাহার ক্ষয়, আর স্বভাবতঃ অল্প বল থাকা এতদুভয়ের ফল একরূপ নহে। একজন যুবক

---

* এখানে আধুনিক নৈয়ায়িক মতের অর্থে মনুষ্যত্বে প্রয়োগ করা হয় নাই, কিন্তু প্রাচীন দার্শনিকেরা জাতিকে "নিত্যানেক সমবেত" বলেন না।

(ক) Curative power

পীড়িত হইয়া এরূপ ক্ষীণবল হইয়াছে যে, দুই সের ভারীর অধিক তুলিতে পারে না আর একটী শিশুও দুসেরের অধিক উত্তোলনে অক্ষম। কিন্তু এতদুভয়ের তারতম্য এই যে, যিনি যুবক, তাঁহার শীঘ্র মৃত্যুর আশঙ্কা আর শিশুটী নিরাপদেই থাকিবে। সেইরূপ, মনুষ্যের ধর্ম্মের বীজ আছে সুতরাং তাহা বিকার প্রাপ্ত না হইলে মনুষ্যের আত্মার ক্ষীণতা হইবে, পশুদের তাহা আদৌ নাই সুতরাং তাহাদের আধিব্যাধিও নাই।

সম্পূর্ণ মানুষ ভারতেই সম্ভবে।

আরও একটী আপত্তি।—অন্যান্য দেশে জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ঔদাসিন্য প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মগুলির বড় উৎকর্ষ লক্ষিত হয় না। বরং নিতান্ত অল্পতাই দেখা যায়; তথাচ সেখানকার লোকেরা এত সবল, সতেজ দীর্ঘায়ু ও দীর্ঘাকায় এবং সম্পূর্ণ মানবের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তবে ধর্ম্মের হ্রাস হইলে মনুষ্যের অসম্পূর্ণতা ও তৎফল অল্পায়ু প্রভৃতি হয়, ইহা কিরূপে সম্ভবে? এ কথার উত্তরে যাহা বলিব, তাহা সকলেরই নিকট বোধ হয় একটু নূতন একটু সংস্কার বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু যাহা যুক্তিসিদ্ধ সত্য তাহা না বলিলে কি প্রকারে চলে?

বাস্তবিক দেখিতে গেলে সম্পূর্ণ মনুষ্য ভারত ব্যতীত কুত্রাপি সম্ভবে না। অন্যান্য দেশমাত্রেরই মানুষ অসম্পূর্ণ থাকিবে। ইতিহাস এবং প্রত্যক্ষই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃত আত্মোন্নতির পরাকাষ্ঠা ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। বিবেক, বৈরাগ্য আত্মবোধ ও অণিমা, লঘিমাদির শক্তি প্রভৃতি মনুষ্যাত্মার যে সকল নিগূঢ় ধর্ম্ম আছে তাহার পূর্ণবিকাশ ভারতেই হইয়াছে। এই ভারতেই একদিন এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম মনুষ্য প্রাণী সেই মহান্ হইতে মহান্ অনন্ত পুরুষকে 'সোহং' ভাবে দেখিয়াছিল। যখন দুর্ব্বাসা শুকদেব, ভৃগু ভার্গব বামদেব, পতঞ্জলি, পঞ্চশিখ, কাঁফাজিনি কপিলাদি ঋষিগণের জ্ঞানময়, তপোময়, ধর্ম্মময় মূর্ত্তি সকল মনোমধ্যে উদিত হয়, যখন তাঁহাদের জ্ঞান বীর্য্য, তপোবীর্য্য ধর্ম্মবীর্য্যের স্মরণ হয়, তখন অন্যান্য দেশ কেন, সুরলোকও তাহার তুলনা-স্থান মনে হয় না। আর্য্যদিগের শক্তি

প্রভাবে স্বরলোকও পরাজিত। কত শত শত দেব শত শত বার ভারতবাসী ঋষিদের নিকট পদনত। কত শত সহস্র আত্মদর্শী পরম ঋষি এই ভারতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা গণনার অতীত। যদি ইতিহাস বিশ্বাস না কর, তবে চল, চন্দ্রনাথ, বারাণসী, হরিদ্বার হিমালয়াদির কন্দরে যাই, আজও শত শত তপোময় দেবোপম মহাপ্রভাব মহাত্মা-আত্মদর্শী সম্পূর্ণ মনুষ্য সকল দেখাইব। কিন্তু অন্য দেশে শুকদেবাদির সদৃশ কত জন লোকের নাম শুন বা দেখিতে পাও?—একজনও না।

ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখাইলাম, আবার আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং বিষয়োন্নতি এতদুভয়ের পরাকাষ্ঠা এক আধারেই দেখিতে চান তাহা হইলেও ভারতেই তাহার শত সহস্র জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাইবেন। চলুন তবে, রাজর্ষি জনকের নিকট যাই; রাজর্ষি ভীষ্মদেবের নিকট উপস্থিত হই, রাজর্ষি অর্জ্জুন, রাজর্ষি যুধিষ্ঠির, রাজর্ষি দম প্রভৃতি ভারতের জ্বলন্ত তারাগুলির সমীপে চলুন, যাঁহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে প্রজ্জ্বলিত রাজসিংহাসনই অধ্যাত্ম যোগাসন, যাঁহারা আসমুদ্র পৃথিবীর ভয়ানক শাসন কার্য্যে নিরত থাকিয়াও সর্ব্বদাই যোগী, সর্ব্বদাই ভোগী ক্ষণকালও আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়েন নাই, দেখিবেন তাঁহারাই একাধারে উভয়োন্নতির চরম দশা দেখাইয়াছেন সম্পূর্ণ মনষ্যত্বের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তাই বলি ভূমণ্ডলে একমাত্র ভারতবর্ষই একাধারে উভয়োন্নতির উপযুক্ত স্থান। এ নিমিত্তই চিরদিন ভারতবর্ষ উভয়োন্নতির নিমিত্তই উন্মত্ত। হউক, না হউক, পারুক, না পারুক, আজও দেশীয় প্রকৃতির প্রেরণা দ্বারা ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক উন্নতির বিরুদ্ধে বিষয়োন্নতি চাহে না।

কিন্তু অন্য দেশের প্রকৃতি অসম্পূর্ণ বলিয়াই উভয়োন্নতির সম্ভাবনা নাই। তাই বলিয়াই অন্য দেশে এ পর্য্যন্ত ঐরূপ কোন দৃষ্টান্ত দেখি না। চিরদিন এবং আজও অন্যান্য দেশ কেবল মাত্র বিষয়োন্নতি লইয়াই উন্মত্ত, কেবল মাত্র বিষয়েই মগ্ন, একমাত্র বিষয়াভিমুখেই অন্য দেশীয় মনঃ প্রকৃতির গতি। ধর্ম্মানুষ্ঠান যাহা কিছু আছে, বিবেচনা করিলে তাহা একরূপ সমাজের বন্ধন রক্ষার নিমিত্ত মাত্র বোধ হয়। মানব প্রকৃতির অসম্পূর্ণতাই ইহার মুখ্যতম কারণ।

যদি অনুসন্ধান করা যায় যে কি কারণে অন্য দেশের মানব প্রকৃতি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ হইল, তবে দেখা যায় যে, দেশীয় প্রকৃতিই তাহার মুখ্যতম কারণ। চতুর্দ্দশটী কারণ দ্বারা মানব প্রকৃতির বিকাশ বা অবনতি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে স্থানীয় প্রকৃতি একটি প্রধান কারণ।

যদি সেই চতুর্দ্দশটী কারণই অনুকূলরূপে সাহায্য করে তাহা হইলেই মানব প্রকৃতির বিকাশ হইতে পারে। আর যদি কতগুলি কারণ প্রতিকূল থাকে তবে পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে না, আবার প্রতিকূল কারণ অধিক হইলে অবনতি হইবারই কথা। ভারতবর্ষে, দেশীয় প্রকৃতি উন্নতির অনুকূল বটে কিন্তু কুসংসর্গ, আলস্য, ও অনালোচনা প্রভৃতি কতকগুলি আগন্তুক দোষ আসিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণ আক্রমণ করিয়াছে। এই নিমিত্ত এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, এই নিমিত্তই সাওতাল প্রভৃতি জাতি ভারতবাসী হইয়াও পশুপ্রায়ে পরিণত। অন্য দেশে অলসতাদি আগন্তুক দোষ নাই বটে, কিন্তু অপরিহার্য্য স্থানীয় প্রকৃতিই তাহাদের সম্পূর্ণতার মুখ্যতম অন্তরায়। এখন দেখা যাউক কি প্রকারে অন্য দেশীয় প্রকৃতি তাঁহাদের পূর্ণতার অন্তরায়।

যাহাদের শারীরিক প্রকৃতি অধিক প্রকার ভৌতিক প্রকৃতির অনুকূল, অর্থাৎ অধিক প্রকার ভৌতিক পরিবর্ত্তনের সহিত যাহাদের শারীরিক প্রকৃতির সামঞ্জস্য থাকে, তাহাদের শারীরিক প্রকৃতিই অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ হইতে পারে। শারীরিক প্রকৃতির সহিত মানসিক প্রকৃতির নিতান্ত ঘনিষ্ঠতা, সুতরাং বিধিমত উপায়ের অবলম্বন করিলে তাহাদেরই মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হইতে পারে, সেই দেশের মনুষ্যেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের অঙ্কুর নিহিত আছে।

আর যে সমস্ত দেশে ভৌতিক প্রকৃতির অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন নাই, সেই সকল দেশের লোকের শারীরিক প্রকৃতিই অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ, থাকিবার সম্ভব সুতরাং মানসিক শক্তি অসম্পূর্ণ, অতএব সে দেশের লোকও অসম্পূর্ণ। দেখুন, আমাদের দেশে পর পর ছয় ঋতুর পরিবর্ত্তন; শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরত, শরতের পর হেমন্ত, হেমন্তের পর আবার শীত। পর পর এই ছয় ঋতুর পরিবর্ত্তনে,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সকল বিষয়েরই নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হয়, এবং সেই সকল পরিবর্ত্তনই আমাদিগের সম্যক্ অনুভূত

হয় সুতরাং আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় সকল প্রকার পরিবর্ত্তনে অভ্যস্ত হওয়ায় সম্যক্ বিকসিত ও সম্পূর্ণ হইবারই কথা। কিন্তু যে দেশে কেবল শীত গ্রীষ্ম বৈ আর ঋতু নাই, সে দেশের লোকের ইন্দ্রিয় সকল কোথা হইতে এরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করিবে? বসন্তের মৃদু মধুর তাপ গ্রীষ্মের তীব্র তাপ, শীতের মিঠুনি তাপ, শাতের থরহরি কম্প—আমাদের শরীরের স্পর্শন শক্তি এই সকল প্রকার পবিবর্ত্তন সহ্য করিয়া সম্যক্ উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু যে দেশে ঋতুর মধ্যে শুধু শীত আর গ্রীষ্ম সে দেশের লোকের স্পর্শন শক্তি কোথা হইতে সম্যক্ উন্নতি লাভ করিবে? আবার দেখ ভারতবাসীর শ্রবণ শক্তি যত তীক্ষ্ণ হইবে ইংরেজ বল ফরাসী বল তাহাদের শ্রবণ শক্তি কখনও সেরূপ তীক্ষ্ণ হইতে পারে না। এই শ্রবণশক্তির সম্পূর্ণতাতেই ভারতে সঙ্গীতশাস্ত্রের এত উচ্চ উন্নতি। ছয় ঋতুর পরিবর্ত্তনে সূর্য্যের আলোক কখন অধিক, কখন অল্প। এইরূপ আলোকের ভিন্ন ভিন্ন রকম পরিবর্ত্তন যাহাদের চক্ষুর উপর প্রতিনিয়ত আধিপত্য করিতেছে, তাহাদের চক্ষুর সহিত শুধু শীত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের চক্ষুর তুলনাই হয় না। এ ছাড়া ভারত যেমন স্বভাবের সৌন্দর্য্যের একমাত্র ভাণ্ডার, প্রকৃতির এরূপ ভাণ্ডার পৃথিবীতে আর কোথায়? হিমগিরির মত রত্ন গিরি ধরাধামে আর কোথায়? হিমালয় দেখিলে নয়ন স্বার্থক, তাহার প্রকাণ্ডত্ব ভাবিলে হৃদয় প্রকাণ্ডত্বের দিকে ধাবমান হয়। আবার এদিকে কলনাদিনী নির্ঝরিণী, সুরম্য বন উপবন, বৈশাখে বিদ্যুদ্দাম চকিত মেঘমালা, বসন্তের সুকোমল কুসুমোদ্গম, এসকল সৌন্দর্য্যে চক্ষুর শিক্ষা, ও মনের শিক্ষা, হৃদয়ের শিক্ষা প্রভৃতি ভারতে যত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, শীতপ্রধান য়ুরোপ, গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকায় সে প্রকার সম্পূর্ণতা লাভের তত সম্ভাবনা নাই। আরও দেখুন, যে, ইন্দ্রিয় থাকাতে মনুষ্যের এ উন্নতি, এ সভ্যতা এ সমাজ, সেই বাগিন্দ্রিয়ই অন্য দেশে কত অসম্পূর্ণ। ভারতবাসীর জিহ্বা অনতিস্থূল-প্রভেদ সম্পন্ন, যতপ্রকার উচ্চারণ সম্ভবে, অন্য দেশবাসীর জিহ্বায় তাহা এক বারেই অসম্ভব। ভারতে ছাপ্পান্নটি বর্ণে ভাষা, ইউরোপে পঁচিশ, ছাব্বিশ- টীর অধিক নহে। *

---

* অনেকের বিশ্বাস আছে, চীন ভাষায় বর্ণসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক।

একজন ইউরোপীয় অনেক দিনের শিক্ষায় অতি যত্নেও ট এবং ত স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে সক্ষম হন না কিন্তু ভারতবাসীর রসনায় কোন্ ভাষা অনুচ্চারিত থাকে? তাই বলি মনুষ্যত্বের পূর্ণতা ভারতেই সম্ভবে।

এখন আর একটী গুরুতর আপত্তি উত্থিত হইল—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, কি ভারতবর্ষ, কি য়ুরোপ, কি আমেরিকা বা আফ্রিকা সকল দেশেই ঋতুর সংখ্যার কমিবেশী থাকিলেও ভৌতিক অবস্থা * পরিবর্ত্তনের সংখ্যা প্রায় সর্ব্বত্রই সমান। ভারতবর্ষে যেমন, পৃথিবীর গতি ভঙ্গী দ্বারা সূর্য্য-কিরণের ইতরবিশেষে, ৩৬৫ দিনে ৩৬৫ প্রকার ভৌতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, দিন দিনই ভৌতিক প্রকৃতি এক একরূপ নূতন ভাব গ্রহণ করে; ঠিক বিষুব রেখার স্থান ভিন্ন, সকল দেশেই এই একই প্রকার পরিবর্ত্তন—সকল দেশেই ৩৬৫ দিনে ৩৬৫ প্রকার ভৌতিক অবস্থা হইয়া থাকে।

সুতরাং ভারতবাসী মানুষেরাও যত প্রকার ভৌতিক পরিবর্ত্তন বহন করে, অন্যান্য দেশবাসী মনুষ্যেরাও তত প্রকার। তবে আর "ভারত-বাসীর প্রকৃতি অধিক বিকসিত এবং অন্য দেশবাসীর প্রকৃতি অল্প বিকসিত হইবে, এ কথার অর্থ কি?

এ বিষয়টী বুঝিতে গেলে বিশেষ একটু মনোযোগ করা আবশ্যক। শুধু ভৌতিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন লইয়াই কথা নহে, কিন্তু ভৌতিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন দ্বারা শরীরাভ্যন্তরেও বিভিন্নরূপ ক্রিয়া হয়, তদ্দ্বারা মানবপ্রকৃতির অধিক বিকাশ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাহা স্বর্গভূমি ভারতবর্ষ ব্যতীত সম্ভবে না। শরীরের আভ্যন্তরিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন বলিলে মোটামোটি যাহা মনে হয়, বাস্তবিক ঠিক তাহাই নহে। অর্থাৎ এক ঋতুতে শরীর নিতান্ত শীতল হইয়া পড়িল, আবার আর এক ঋতুতে অত্যন্ত উষ্ণ এ প্রকার নহে। কারণ

কিন্তু বাস্তবিক চীনে বর্ণজ্ঞান আদৌ নাই। তাহাদের এক একটী কথা বুঝাইতে এক একটী সতন্ত্র ২ চিহ্ন আছে। যেমন পিতা বুঝাইতে একটি, মাতা বুঝাইতে আর একটী চিহ্ন ইত্যাদি তাহাদের বর্ণমালা ও অভিধান প্রায় একই কথা।

* Weather.

ভৌতিক প্রকৃতি যতই কেন শীতল বা উত্তপ্ত না হউক, শরীরের তাপ সকল সময়েই এক পরিমাণে থাকে।

মনুষ্য-শরীরের তাপ যদি ৯৯ রেখার অতিরিক্ত কিম্বা ৯৭ রেখার কম হয় তাহা হইলে, সচরাচর শরীর রক্ষিত হয় না। এজন্য বাহিরের বায়ু যখন গ্রহণযোগ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত শীতল হয়, এবং তাহার সংস্পর্শে শরীরের তাপের অধিক পরিমাণ ক্ষয় হইতে থাকে তখন আমরা শরীরের অভ্যন্তরে একরূপ যন্ত্রবিশেষ-ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা, উষ্ণবীর্য্য আহারাদি দ্বারা—শরীরের তাপ বৃদ্ধি করিয়া এবং বাহিরেও বস্ত্রাদি ব্যবহার দ্বারা তাপ ক্ষয়ের বাধা দিয়া—পরিমিত তাপই রক্ষা করিয়া থাকি।

আবার যখন বাহিরের বায়ু উষ্ণ হয়, যাহার সংস্পৃর্শে শরীরের তাপ ক্ষয়ের কিছুমাত্র সাহায্য হয় না, তখন শরীরে অভ্যন্তরে প্রযত্ন বিশেষের দ্বারা এবং ঘর্ম্মাদি দ্বারা আমরা তাপের বিমোক্ষণ করি, এবং বাহিরেও জল সেচনাদি উপায় দ্বারা কিছু সাহায্য করি। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত নিয়মিত তাপই রক্ষা করিয়া থাকি। ভৌতিক প্রকৃতি যতই কেন উষ্ণ, শীতল না হউক, শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্র দ্বারা আমরা তাহার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লই। সুতরাং সহজজ্ঞানে ঋতুভেদে শরীর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন বুঝা যায় না।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। ভৌতিক প্রকৃতির উষ্ণতা যখন সম্ভবতঃ—৭৫ হইতে ৮০ রেখার মধ্যে থাকে, তখন তাহা আমাদের শরীর প্রকৃতির ঠিক অনুকূল হয়। অর্থাৎ তখন ঐ বায়ু আদির দ্বারা আমাদের শরীরীয় তাপের অধিক পরিমাণ ক্ষয় হয় না আবার অত্যল্প ক্ষয়ও হয় না তখন সম্ভবমত ক্ষয় হয়। সুতরাং তখন আমাদের তাপের বৃদ্ধি বা বাহির করিবার নিমিত্ত কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু যখন ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৭৫ রেখা অপেক্ষায় কমে তখন তাহার সংস্পর্শে আমাদের তাপ অধিক পরিমাণ ক্ষয় হয় বলিয়া তাপ সঞ্চয়ের নিমিত্ত শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রের আবশ্যক হয়। আর যখন ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৮০ রেখা অপেক্ষা অধিক হয় তখন উহার উপযুক্ত মত ক্ষয় হয় না, বলিয়া আভ্যন্তরিক যন্ত্রে উহা শরীর হইতে বাহির করা প্রয়োজন

হয়। এই যে অবস্থাদ্বয়ে একবার শরীরকে আভ্যন্তরিক যন্ত্রদ্বারা তাপ বৃদ্ধির নিমিত্ত চেষ্টিত হইতে হয়, আবার তাপক্ষয়ের নিমিত্ত চেষ্টিত হইয়া অন্তরে অন্তরে ক্রিয়া করিতে হয় ইহার নাম “ ভৌতিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে শারিরীক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন।” এইরূপ পরিবর্ত্তন ভারতবর্ষ ব্যতীত কুত্রাপি সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ভারতবর্ষে পৌষমাসে ভৌতিক তাপ কোন খানে ৬০ রেখারও কম, আবার জ্যৈষ্ঠমাসে কোন খানে ৯০ রেখারও অধিক হয়। সুতরাং ভারতবর্ষীয় শারিরীক প্রকৃতি, তাপের বৃদ্ধিও বিমোক্ষণ এই দুই প্রকার ক্রিয়াতেই অভ্যস্ত। এক্ষণে প্রায় আশ্বিন মাসের ১০ই হইতে চৈত্র মাসের ১০ই পর্য্যন্ত আমাদিগকে তাপ বৃদ্ধির নিমিত্ত আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়াবিশেষ করিতে হয়, আবার চৈত্র হইতে আশ্বিনের ১০ই পর্য্যন্ত তাপ বিমোক্ষণের চেষ্টা করিতে হয়। এতদুভয়বিধ ক্রিয়া আমাদের দিন দিনই কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন যে আমরা বাহিরের বস্ত্রাদির উপায় দ্বারা তাপ সামঞ্জস্য করি ইহাতে আভ্যন্তরিক ক্রিয়া কোথা হইতে আসিল? বাস্তবিক তাহা নিতান্ত ভুল। কারণ, দরিদ্র এবং যোগনিরত মনুষ্যগণ ও শৃগাল শূকরাদি প্রাণীরও-ঋতু পরিবর্ত্তনে তাপের সামঞ্জস্য রাখিতে হয়। তাহাদেরও বস্ত্রাদি নাই, তবে কি উপায়ে উহারা এ কার্য্য সম্পন্ন করে?—শরীরের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা। সেইরূপ সকলেরই আভ্যন্তরিক ক্রিয়া বিশেষ করিতে হয় তবে বস্ত্রাদিও সম্বল বটে।

সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির সামঞ্জস্যই তাপ ও তড়িদাদির উপর নির্ভর করে, সুতরাং তাপ লইয়া যে আমাদের ঐরূপ বিচিত্র ক্রিয়া করিতে হয় তাহার সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তিরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, অতএব ঐ ক্রিয়ার বিচিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়শক্তি এবং সমস্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তিরই বিচিত্রতা জন্মে; সেই বিচিত্রতাই পূর্ণতার কারণ।

আবার দেখুন, আফ্রিকার ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৭৫ রেখার নীচে কখনই হয় না সর্ব্বদা উহার অধিকই থাকে। সুতরাং আফ্রিকাবাসীদের শরীর কখনই তাপের সঞ্চয় নিমিত্ত আন্তরিক প্রক্রিয়া বিশেষ করে না, বারমাস তাপ পরিমোচনের চেষ্টাই করে। আবার ইংলণ্ড আইস্লণ্ড প্রভৃতি

স্থানেও ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৮০ রেখার উপর কখনই উঠে না; বার. মাস উহার নীচেই থাকে। সুতরাং ঐ সকল দেশবাসীর শারিরীক প্রকৃতি কখনই তাপ বিমোক্ষণের নিমিত্ত আভ্যন্তরিক যন্ত্রবিশেষ করে না; তাপ সঞ্চয়ের নিমিত্তই সর্ব্বদা ব্যগ্র। অতএব ঋতু পরিবর্ত্তনে আফ্রিকাদি অন্যান্য দেশের শরীরপ্রকৃতির প্রকৃতরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। এই নিমিত্ত অন্য দেশীয় ইন্দ্রিয়শক্তি, মনের শক্তি, চিরদিন অসম্পূর্ণ থাকিবারই সম্ভাবনা। সুতরাং ধর্ম্মশক্তিও অতি অসম্পূর্ণই থাকিবার কথা। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা সেই দেশের মতে অসম্পূর্ণ নহে। কারণ সেই দেশে যতটুকু সম্ভব ততটুক হইলেই সেই দেশের মতে তাহারা সম্পূর্ণ হইতে পারে। অতএব তাহাদের অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন ব্যাধি ও শোক তাপাদি দ্বারা অভিভূত হওয়া সম্ভবে না। ইহার উদাহরণ পশ্বাদির অসম্পূর্ণতা প্রবন্ধে পরিদর্শিত হইয়াছে। অতএব ধর্ম্মবিষয়ে অন্য দেশের দৃষ্টান্তে চলিলে আমাদের কুশল নাই। ভারতীয় মনুষ্যের আত্মাতে পূর্ণ প্রকৃতির অঙ্কুর নিহিত আছে তাহা বিকাশ প্রাপ্ত না করিলে নিশ্চয়ই ভারতের বিনাশ। *

ধৰ্ম্মের ক্ষয়ে মনুষ্য মনুষ্য-চর্ম্মাচ্ছাদিত পশু।

আত্মার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিলে, দেখা যায় যে মনুষ্যাত্মা ও পশুর আত্মাকে পরস্পর বিভিন্ন করার নিমিত্ত ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। কারণ ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়াই আত্মার মনুষ্যভাব হইয়াছে ইহা বিস্তার রূপে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দর্শন, স্পর্শনাদি ইন্দ্রিয়শক্তি, কাম ক্রোধাদি মানসিক শক্তি, ইহা মনুষ্যবৎ অনেক পশুরই আছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মই কেবল একমাত্র মনুষ্যতে থাকে সুতরাং সেই ধর্ম্মগুণের ক্ষয় হইলে, অন্য জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যের বিশেষ কি? কি লইয়া মানুষেরা আত্মাকে মনুষ্যাত্মা মনে করিবে? কোন্ আভ্যন্তরিক গুণের দ্বারা আমাদের আত্মা, পশুর আত্মা হইতে বিভিন্ন থাকিবে?

---

* কেহ মনে করিবেন না যে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে পূর্ণাবস্থা বলা হইতেছে। আমরা এখন সম্পূর্ণতা দূরের কথা কুসংসর্গাদি দ্বারা অরণ্যের উদ্দাম পশু হইতেও অধম অবস্থায় আসিয়াছি। তাই বলিয়াই এত ক্রন্দন।

কেহ মনে করিতে পারেন মানুষের অনেক প্রকার কৌশল বুদ্ধি আছে. অধ্যয়নাদি দ্বারাও অনেক পদার্থের বিচিত্র ও অদ্ভুত তত্ত্ব জানিতে পায়। ইহাই মানুষের মনুষ্য গরিমা রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক? কারণ ঐ সকল গুণ ন্যূনাধিকরূপে মনুষ্য ব্যতীত অনেক প্রাণীতেই আছে। ভাবিয়া দেখুন বানরাদি দ্বিপদ পশুগণের কি কৌশল বুদ্ধি কিছুই নাই? উহারা কি আপন আপন স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যকলাপ সম্পন্ন করে না? দেখিয়া বা শুনিয়া কি কতকগুলি বস্তুকে আপনার পরিচিত করে না? অবশ্যই করে। তবে এই মাত্র বলা যায় যে মনুষ্যে ঐ সকল গুণ অধিক প্রকাশিত। তাই বলিয়া ঐ সমস্ত সাধারণ গুণের সহিত মনুষ্যত্বের কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ঐ সকল গুণের উন্নতি দ্বারা মনুষ্যত্বের উন্নতি হয় না। অতএব ধর্ম্মোন্নতি না থাকিলেই মানুষগণ স্থূল জ্ঞানের উন্নতি সত্ত্বেও মনুষ্য চর্ম্মে আবৃত পশু ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিতান্ত জড় বুদ্ধিদের বিচিত্র পরিচ্ছদ, বিচিত্র ভবন, বিবিধ রসযুক্ত আহার, এবং দাস দাসীর সেবাদি দ্বারাও মনুষ্যত্বের অভিমান হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা যে নিতান্ত বৃথাভিমান তাহা ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক। কারণ বুদ্ধিমান্ মাত্রেরই উহা অবিদিত নাই।

ধর্ম্মের ক্ষয়ে বংশ পরম্পরা মানুষের বনমানুষাদি হইবার সম্ভাবনা।

মহাভারতাদি ইতিহাস এবং বর্ত্তমান নানাবিধ জাজ্জ্বল্যমান চিহ্নের প্রতি মনোনিবেশ করিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যে ত্রিপুরপর্ব্বতবাসীরা আজ কুকী বলিয়া বিখ্যাত, যে মণিপুরবাসীরা আজ নাগা বা মণিপুরে ভূত নামে পরিচিত এবং যে অঙ্গদেশবাসীরা সাঁওতাল বলিয়া ঘৃণিত ভাবে উপেক্ষিত হইতেছে, একদিন ঐ সকল জাতীয়েরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি উৎকৃষ্ট আর্য্যজাতীয় থাকিয়া ভারতের যশঃসৌরভ দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ করিয়াছিল। তাহারাই আজ ঈদৃশ নরক অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। কারণ ইহাও ইতিহাসাদি দ্বারাই জানা যায় যে, ঐ সকল দেশে পূর্ব্বে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় রাজগণের রাজধানী ছিল।

ত্রিপুর পর্ব্বতে আর্য্যকুল ধুরন্ধর ত্রৈপুরেশ্বরের রাজনগরী, (১) অঙ্গদেশ মহাবীর কর্ণের নগরী (২) এবং মণিপুরের পূর্ব্বভাগে ও নিজ মণিপুরে ক্ষত্রিয়কুলতিল বভ্রুবাহনের রাজধানী ছিল (৩)। কিন্তু সভ্য প্রজা না থাকিলে সভ্যতম রাজা থাকাও অসম্ভব। কারণ, এই সকল সভ্যকুলের চূড়ামণি রাজগণ মন্বাদি শাসন শাস্ত্র অবলম্বী ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা বর্ত্তমান পশুবিশেষ ও রাক্ষসবিশেষ লইয়াই রাজত্ব করিতেন তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। প্রাচীনকালে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্তই ভূপতির প্রয়োজন ছিল। সুতরাং যে রাক্ষসাদির ধর্ম্মজ্ঞানই আদৌ নাই, তাহাদের আর শাসন কি? তাহাদের আর রাজাই কি? কিছুই না। সুতরাং পূর্ব্বে ঐরূপ পশুময় ও রাক্ষসময় রাজ্য হইলে কর্ণ প্রভৃতি রাজগণ কোন্ প্রজার কুলধর্ম্ম, কোন্ প্রজার জাতিধর্ম্ম, কাহারই বা আশ্রমধর্ম্ম দণ্ডবলে সংরক্ষণ করিতেন।

যদি বল, সভ্য মানুষ ছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে তাহারা বিনষ্ট হওয়ায় অন্য স্থান হইতে সমাগত অসভ্যগণ ঐ সকল স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ আজও প্রকাশিত জনরব আছে যে সেই ত্রিপুরেশ্বরের বংশীয় আগরতলার মহারাজা সেই কুকীদিগের সহিত সজাতীয় ভাব দেখাইয়া কুকীদের নিকট সহানুভূতি

১। চেদিদেশকে ত্রৈপুর বা ত্রিপুরীদেশ বলে—(হেমচন্দ্র দেখ)। এখানকার রাজা দমঘোষ, শিশুপালাদি ছিলেন।

২। বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনে শান্তগং শিবে। তাবদঙ্গাভিধো দেশ— ইত্যাদি শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ৭ পটল। কর্ণের নাম অঙ্গরাট্, অঙ্গাধিপ—(হেমচন্দ্র দেখ)।

৩। শ্রুত্বা তু নৃপতিঃ পার্থং পিতরং বভ্রুবাহনঃ।
নির্যযৌ বিনয়েনাথ ব্রাহ্মণার্থ পুরঃসরঃ।
মণিপুরেশ্বরস্ত্বেবমুপাস্তং ধনঞ্জয়ঃ—ইতি মহাভারতং
আশ্বমেধিক পর্ব্ব ৮০ অং।

(অতি সরল সংস্কৃত বলিয়া অর্থ করা গেল না।)

প্রাপ্ত হয়েন। এবং প্রায় আধ আধ কুকীগণের সহিত রাজবংশের বিবাহাদি সম্বন্ধও আছে। কিন্তু রাজা স্বয়ং ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহারই করেন। অতএব ইহা বিশ্বাস হয় যে ঐ কুকী ও নাগাদিরা একদিন সভ্য মানুষ ছিল। তবে ইহা অবশ্যই হইতে পারে যে ঐ সকল দেশে কুকী প্রভৃতি অসভ্য মানুষও ছিল, ক্রমে ক্রমে সভ্যমানুষ আর তাহারা একই হইয়া গিয়াছে। কুকীদের সম্বন্ধে যেরূপ, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যগণের সম্বন্ধেও সেইরূপ। সাঁওতালাদির স্থানে এমন অনেক তত্ত্ব বর্ত্তমান আছে যাহা দ্বারা বুঝা যায় সভ্যমানুষ ক্রমে ক্রমে অসভ্য হইয়া বর্ত্তমান দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? মনুষ্যত্বের ক্রমাবনতিই ইহার একমাত্র কারণ। অলসতা, সদ্বৃত্তি সমূহের অনালোচনা, কুসংসর্গ প্রভৃতি কারণে ঐ সমস্ত সভ্যজাতির মনুষ্যত্বের যে ক্রমে হ্রাস হইয়া এক্ষণে বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এই বিষয় আমরা একটী পরীক্ষিত প্রমাণ দর্শাইতেছি।

অনেকেই জানেন কয়েক বৎসর অতীত হইল বৃকের (নেকড়ে বাঘের) গহ্বরে দুইটী ১৫। ১৬ বয়য় মনুষ্য পাওয়া গিয়াছিল ও পরিদর্শনার্থ তাহারা প্রয়াগে আনীত হইয়াছিল। বৃকেরা যেসমস্ত মনুষ্যশিশু অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, সকল সময় তাহাদের বিনাশ সাধন করে না, কোন কোনটীকে বা আহারাদি দ্বারা পালন করে। সেই দুইটী মনুষ্য এইরূপে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বৃকদ্বারা পালিত হইয়া তাহাদের গহ্বরে ছিল। যখন তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছিল, তখন তাহারা দুই হস্তে ও দুই পদে পশুর ন্যায় গমনাগমন করিত, তাহাদের গাত্রের লোম মনুষ্য-লোমাপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ হইয়াছিল এবং তাহাদের দন্ত সকল ঈষৎ সূক্ষ্মাগ্র (সূচল) হইয়াছিল। প্রায় ষোড়শ বৎসর ক্রমাগত পশুর সহবাসে পশু কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং জন্মাবধি মনুষ্যবৃত্তির পরিচালনা করে নাই, তাহাতেই তাহাদের বাহিরের আকার পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে মনুষ্যোচিত বৃত্তির অবনতিকত মনুষ্যোচিত আকারেরও অবনতি হয়। সুতরাং মনুষ্যোচিত বৃত্তির পরিবর্ত্তন ও তৎসঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যশরীরেরও পরিবর্ত্তন হইতে হইতে মনুষ্য যে প্রকৃত

পশুত্বে পরিণত হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপে তাহা সম্ভবপর হয়।

পূর্ব্বে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে,ভগবানের নিয়মানুসারে আত্মার শক্তির দ্বারা সমস্ত প্রাণি-শরীর সংগঠিত হয়। আত্মার শক্তিগুলি, বাহ্য বা আন্তরিক পদার্থের সহিত সম্মিলিত করার নিমিত্ত যে মস্তিষ্ক ও চক্ষু কর্ণাদি কতকগুলি যন্ত্রসমষ্টি তাহাই শরীর নামে খ্যাত। যে প্রাণীর আত্মার শক্তি যত প্রকার তাহার শারীরিক যন্ত্রও তত প্রকার। সকল প্রাণীর আত্মার শক্তি এক প্রকার নহে সুতরাং সকল প্রাণীর শরীরও এক প্রকার নহে। এবং ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আত্মার শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারাই শরীরের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া প্রাণিজগৎ স্থাবর হইতে ক্রমে ক্রমে এই মনুষ্য শরীরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আবার ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যে গুণ গুলির অঙ্কুর হইয়া প্রাণিজগৎ পশুভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনুষ্যত্বে পরিণত হইয়াছে (আমাদের ধর্ম্ম) তাহা যদি ক্রমেই উপেক্ষিত হইয়া অস্ফুরিত ও অপরিচালিত হইতে থাকে, কেবলমাত্র পশু সদৃশ গুণ গুলি অনুশীলিত হয়, তবে শরীরযন্ত্রগুলিও অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, শারীরিক যন্ত্রগুলি যতই অল্প পরিমাণে পরিচালিত হয়, ততই তাহাদের পুষ্টির হ্রাস ও ক্ষীণতা হইবে। এবং যতই অধিক পরিমাণে পরিচালনা করিব ততই তাহার পুষ্টি সংসাধিত হইবে। (কিন্তু পরিমাণের অধিক পরিচালনা করিলেও আবার ক্ষীণতাই হয়।)

কি মস্তিষ্ক, কি হৃৎপিণ্ড, ফুস্ ফুস্, সমস্ত শারীরিক যন্ত্রেরই এই নিয়ম।

এখন দেখুন! যে ধর্ম্ম নামক শক্তিগুলির অঙ্কুর ভাব হইয়া আমরা মনুষ্য (মনুষ্যের উৎপত্তি দেখ) উহাদের পরিস্ফুরণেরযন্ত্র আমাদের মস্তিষ্কের উপরের অংশ। যখন আমরা ঐ সকল ধর্ম্মাঙ্কুর বিকাশের চেষ্টা না করিয়া উপেক্ষা করিতে থাকিব এবং কেবল মাত্র সাধারণ ধর্ম্ম (অধর্ম্মের লক্ষণ ও বর্ণনা দেখ) গুলির অনুশীলন করিব, তখন শারীরিক অন্যান্য যন্ত্রগুলি বিলক্ষণ পরিপুষ্ট ও সুদৃঢ় হইবে সত্য, কিন্তু মস্তিষ্কের উপরিভাগটি

ক্রমেই হতশ্রী ও যতদূর সম্ভব ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া কিছু একটু বৈলক্ষণ্য হইবে। ধর্ম্মের শক্তি গুলি স্ফুরিত না হওয়া হেতুক ক্রমে উহাদের স্ফুরণ ক্ষমতার হ্রাস হইতে থাকিবে। পরে এই অবস্থায় যে সন্তান প্রসূত হইবে তাহার ধর্ম্ম শক্তি বিকাশের ক্ষমতা কম হইয়াই সে ভূমিষ্ঠ হইবে। অতএব তাহার মস্তিষ্কের গঠন একটু অন্যরূপ হইবে এবং ঐ সন্তান বিশেষরূপ যত্ন করিলেও তাহার পিতা যতদূর ধর্ম্ম শক্তির বিকাশ করিতে পারিত ততদূর পারিবে না। কারণ তাহার মস্তিষ্কের আর ততদূর ক্ষমতা নাই। পরে সে যদি আবার ধর্ম্ম শক্তির বিকাশে সাধ্যমত যত্নবান্ না হয়, কেবল সাধারণ ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে তবে তাহারও মস্তিষ্কের উপরিভাগ আরও একটু হতশ্রী, আরও একটু ক্ষীণ ও কিছু একটু বিসদৃশমত হইবে। এই প্রকারে তাহার সন্তান আবার আরও একটু অন্য রকম হইবে। এইরূপে বহুকাল পরে যদি মনুষ্য-জগৎ অন্যান্য কারণে একেবারে বিনষ্ট বা উচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, তাহা হইলে মনুষ্যের আকৃতি কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া হইয়া সহস্র সহস্র বৎসরের পর যে আমাদের বৃদ্ধ প্রপৌত্রগণ পুনর্ব্বার ক্রমে সাঁওতাল, কুঁকী, রাক্ষস, বনমানুষ হইবে, ইহা অব্যর্থ সিদ্ধান্ত বলিয়াই বোধ হয়। ভগবান্ পতঞ্জলির বিজ্ঞানোপবৃংহিত "জাত্যন্তর পরিণাম" ইত্যাদি সূত্র দ্বারাও আভ্যন্তরিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে উন্নতি ও অবনতি এতদুভয়ই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতএব বলি, এখন সকলেই আপন আপন মনুষ্যত্বরক্ষার নিমিত্ত, ভারতের গৌরব পালনের নিমিত্ত, আর্য্যকুলের মহত্ত্বধ্বনি উদ্‌ঘোষণের নিমিত্ত যত্নবান হউন, যাহাতে ভারতবর্ষ বংশপরম্পরা ক্রমে নীচ হইতে নীচতম জন্তুবিশেষ না হয় তাহা করুন।

ধর্ম্মের অভাবে আর্য্যবংশের উৎসেদের সম্ভাবনা এবং ধর্ম্ম থাকিলে থাকিবার কথা।

যেরূপ শরীর আত্মার সম্বল তেমন মন ও আত্মার সম্বল, যেরূপ শরীরের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা দ্বারা আত্মার পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা তেমন মনেরও পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা দ্বারা আত্মার বলিষ্ঠতা। শরীর এবং মন এতদুভয়ের বল একত্রিত

হইয়া আত্মাকে পূর্ণশক্তিমান্ করে। শরীর এবং মন এতদুভয় যাহার অসম্পন্ন তাহার আত্মাও অসম্পন্ন হয়। বরং শরীর ক্ষীণ বীর্য্য হইলেও মন যদি অধিক বীর্য্যবান হয়, তাহা হইলে মন শরীরের দুর্ব্বলতার ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে, কিন্তু মন দুর্ব্বল থাকিলে শরীর তাহার ত্রুটি পূরণে সমর্থ হয় না। এ বিষয়ের প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত আমরা পরে দেখাইব। এক্ষণে দেখা যাউক কি প্রকারে শরীর ও মনের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা হয়।

যথোচিত পরিচালনা দ্বারা শরীরের পুষ্টি এবং বলিষ্ঠতা জন্মে। উত্তমরূপে পরিচালনে অস্থি মাংসাদির অণু সকল সুদৃঢ়রূপে সন্নিবেশিত ও সংহত হয়। কিন্তু শরীরের কোন একটী অঙ্গের পরিচালন দ্বারা সমস্ত অঙ্গের সুদৃঢ়তা বা বলিষ্ঠতা হয় না, সমস্ত অঙ্গের পরিচালনা করিলেই সমস্ত অঙ্গের বলিষ্ঠতা হয়।

মনেরও পরিচালনা দ্বারাই পুষ্টি এবং বলিষ্ঠতা। মনেরও কতকগুলি অঙ্গ আছে, পরিচালনা দ্বারাই সেই অঙ্গগুলি সুদৃঢ়রূপে সন্নিবেশিত হয়। মনেরও একাঙ্গের পরিচালনা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা হয় না, উহারও সর্ব্বাঙ্গেরই পরিচালনা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গের বলিষ্ঠতা জন্মে।

মনের অঙ্গ সকল ভাবময়—শক্তিময়, উহা ভৌতিক পদার্থময় নহে। মনে যত প্রকার শক্তি আছে তাহারা প্রত্যেকেই মনের এক একটী অঙ্গস্বরূপ। ঐ সকল ভাব বা শক্তির পরিচালনা দ্বারা মনের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা হয়। তাহার নিয়ম এই,—ধৃতি, ক্ষমা, দম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বিবেক, বৈরাগ্য, আত্মানুভবের ক্ষমতা, শান্তি, সন্তোষ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, ধীশক্তি প্রভৃতি যে সকল শক্তির অঙ্কুর মনে আছে, তাহাদের বারম্বার বিকাশ ও পরিচালনা দ্বারা সেই সকল শক্তিগুলি পূর্ব্বোক্ত মতে (ধর্ম্মের অবস্থা দেখ) সংস্কার অবস্থায় মনোমধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে। সেই সঞ্চিত সংস্কারগুলির এইরূপ ভাবে থাকা চাই যে, যেন নদীর তরঙ্গের ন্যায় থেকে থেকে সর্ব্বদাই এক একটী ধর্ম্মশক্তির উন্মেষ হইয়া উঠে, যেন সর্ব্বদাই একবার বিবেক, একবার বৈরাগ্য, একবার আত্মানুভব, একবার দম, একবার ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ইত্যাদি শক্তি সকল মনোমধ্যে আপনাপনিই উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাহারই নাম সংস্কারের সন্নিবেশ বা মনের অবয়বের সন্নিবেশ হওয়া। মনের

যত অধিক সঙ্খ্যক ধর্ম্মশক্তিগুলি যত অধিক বেগে, অধিক সঙ্খ্যায় বারম্বার পরিচালনা করা যায় ততই সেই সেই বিকশিত শক্তিগুলি দৃঢ় মূল হইয়া আত্মাতে সন্নিবেশিত হয়। সুতরাং তদ্দ্বারা মনের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা-বৃদ্ধি হয়। আর মনের শক্তির সংখ্যা যতই অল্প, বিকাশের পরিমাণ যতই অল্প, পরিচালনার বারের সংখ্যা যতই অল্প ততই সংস্কার দুর্ব্বল, ক্ষীণ এবং কম হয় সুতরাং মনের দুর্ব্বলতা আত্মার দুর্ব্বলতা। এমন কি মনের যদি সংস্কার আদৌ না থাকে, তবে মনের অস্তিত্বই থাকে না—সংস্কারই মনের অস্তিত্ব ভিত্তি, সংস্কার রাশি দ্বারাই মনকে ধরা যায়। ভগবান্ পতঞ্জলির পাতঞ্জল-দর্শনের দ্বিতীয় পাদের ত্রয়োদশ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস ইহাই বলিয়াছেন "ক্লেশ—কর্ম্মবিপাকানুভবনির্ম্মিতাভিস্তু বাসনাভিরনাদিকালসম্মূর্চ্ছিতমিদং চিত্তং চিত্রীকৃত মিব সর্ব্বতো মৎস্য জালং গ্রন্থিভিরিবাততম্"—রাগ দ্বেষাদি অনুভবের সংস্কার, এবং শরীর মধ্যে সর্ব্বদা যে সকল ক্রিয়া হয় (সুখ, দুঃখ, আহার, ব্যবহার ইত্যাদি) তাহার অনুভবের সংস্কার রাশির, পর পর সন্নিবেশের দ্বারায় আমাদের মন বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে যেমন শণের সূত্র গ্রন্থি সমূহের সন্নিবেশ দ্বারা বিস্তৃত একগাছি মৎস-জালে পরিণত হয় তেমন ঐ সংস্কার রাশির দ্বারা (এবং পূর্ব্বে যে ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কার কথা বলা হইয়াছে তদ্দ্বারা) আমাদের মন বিস্তৃতায়তন হইয়াছে, এক একটী সংস্কারই মনের অস্থি বা পঞ্জর স্বরূপ এক একটী গ্রন্থি বিশেষ যেরূপ জালের গ্রন্থিগুলি বাদ দিলে আর জাল না, শুধুই সূত্র তেমন সংস্কার বাদ দিলেও আর মন থাকে না—* মনে কর এ পর্য্যন্ত যেন তোমার মনে কোন প্রকার প্রবৃত্তিরই পরিস্ফুরণ হয় নাই, যেন দর্শন, স্পর্শন, বা শ্রবণ, বা কোন প্রকার চিন্তা বা কোনরূপ সাধু অসাধু ভাবেরই কখনও উদ্দীপনা হয় নাই, যেন

---

* কেহ যেন মনে করেন না যে এতদ্দ্বারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ন্যায় মস্তিষ্কের সংস্কার রাশিকে মনের ভিত্তি বলা হইল। যে সকল শক্তি হইতে ঐ সকল সংস্কার গঠিত হয় তাহা আমাদের মতে স্বতন্ত্র ও মস্তিষ্ক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

কোন প্রকার ক্রিয়ারই সংস্কার তোমার আত্মাতে নাই। এখন দেখ দেখি তুমি কি থাক, কোথায় তোমার মনের অস্তিত্ব থাকে? কিছুই না কেবল অচেতন শরীরেরই অস্তিত্ব থাকিবে। পূর্ব্বেকার ঘটনাগুলি মনে পড়ে বলিয়াই—পূর্ব্বেকার ঘটনার সংস্কারগুলি মনে আছে বলিয়াই মনের অনুভব করিতে পার, তুমি আপনাকে অনুভব করিতে পার। পূর্ব্বেকার বিকশিত শক্তিগুলিই মনের পঞ্জর স্বরূপ।

এইরূপে মনের বলিষ্ঠতা ও আত্মার বলিষ্ঠতা হয়।* এইরূপ বলিষ্ঠতা দ্বারা আত্মার তেজের বৃদ্ধি হয়, যে তেজকে আর্য্যেরা "তনুপা" নামে অভিহিত করেন। যে আত্মার শক্তি বলবতী এবং তেজও অধিক, সে আত্মার জীবনী-শক্তিও অধিক বলবতী। অতএব আমরা যদি বিবেক, বৈরাগ্যাদি ধর্ম্মশক্তির উপযুক্ত পরিচালনা না করি, তবে মনের ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা দ্বারা জীবনীশক্তির হ্রাস হয়।

এ দিকে, আমরা পরাধীন; পরাধীনতায় মনোবৃত্তি গুলি সহজেই প্রশস্ত ও বিস্তৃত হইয়া বিকাশিত হইতে পারে না। অনেকটা সঙ্কুচিত থাকে, অন্যের স্বামিত্বভাব আসিয়া যেন আমাদের মনকে আক্রমণ পূর্ব্বক অভিভূত করিয়া রাখে, সুতরাং এতদ্বারাও আত্মার শক্তির হ্রাস হয়। এ অবস্থায় যদি আমরা সমস্ত ধর্ম্ম শক্তিগুলির পরিচালনা দ্বারা আত্মার ওজস্বিতা সংরক্ষণ না করি, তবে দিন দিনই আমাদের জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া ক্রমে উৎসেদ হইবার সম্ভাবনা। আমার বোধ হয়, ধর্ম্মশক্তির উপেক্ষাতে এখন আমাদের আত্মার যেরূপ ক্ষীণতা হইয়াছে, ইহাতে যদি ভারতবর্ষ বিদেশীয় রাজবংশের উপনিবাস হইত, তবে এতদিন আমাদের আমেরিকার দশা প্রাপ্ত হওয়াও অসম্ভব ছিল না।

গবাশ্বাদি পশুগণের আমাদের মত অসঙ্খ্য মনোবৃত্তি নাই, যাহা কিছু আছে তাহারও কোনটিরই উত্তমরূপ সংস্কার থাকে না। উহারা দেখিতে দেখিতেই ভুলিয়া যায় শ্রবণ মাত্রেই বিস্মৃত হয়। পশুদের দর্শন, স্পর্শন,

---

* আত্মজ্ঞানের স্থল ভিন্ন কখনই যেন মন প্রভৃতি বাদ দিয়া কেহ আত্মা বুঝেন না। চৈতন্য যুক্ত মনই—অন্তঃকরণই ব্যবহারিক আত্মা।

আঘ্রাণ, শ্রবণ বা কামাদি প্রবৃত্তি যাহা কিছু মনোমধ্যে বিকশিত হয়, প্রায় তৎক্ষণাৎ তাহা একবারে মন হইতে দূরীভূত হয়। উহারা পূর্ব্বেকার ঘটনাবলী মনে করিয়া কোন কার্য্যই করে না, উহাদের সকল কার্য্যই উপস্থিত মত। এ নিমিত্ত পশুদিগের মনের অবয়ব সন্নিবেশ হয় না—মনের অঙ্গপুষ্টি হয় না, সুতরাং মনের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা হয় না, সুতরাং আত্মারও এক অঙ্গ ক্ষীণ হইল। অতএব পশুদের আত্মা নিস্তেজ এবং দুর্ব্বল ও নিতান্ত ক্ষ ণ সুতরাং তাহার জীবনীশক্তিও নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বলা। এ নিমিত্ত পশুদের শরীর অতিশয় বলবান্ হইলেও অধিক দিন জীবিতে পারে না। হস্তী অতিশয় বলবান্ ও বৃহৎ শরীর হইয়াও ক্ষুদ্র শরীর মনুষ্যের তুলনায় অত্যল্পজীবী। পশুর মধ্যেও যে জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক। তাহাদের দৈহিক বল অল্প থাকিলেও তাহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী। অতি বৃহৎ শরীর গবাদি পশু অপেক্ষায় আধ্যাত্মিক কিছু উন্নত ক্ষুদ্র শরীর বানরাদির জীবন দীর্ঘ। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলেই যে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক অবনতি দ্বারা ক্রমে ক্রমে জীবনীশক্তির ক্ষয় ইহা অব্যর্থ বলিয়াই বোধ হয়। জীবেরই শক্তিবিশেষ জীবনীশক্তি, অতএব সেই জীবের (আত্মার) অঙ্গহীন হইলে যে তাহার শক্তির হ্রাস হইবে না ইহা বোধ হয় উন্মত্ত ব্যতীত আর কেহই বলিবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি আত্মার পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা দ্বারা জীবনীশক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত সকলগুলি আধ্যাত্মিক শক্তিরই বিকাশ ও পরিচালনার আবশ্যক। তবে ক্রোধ, ঈর্ষা প্রভৃতিও আত্মার শক্তি বটে, উহারাও মনের অঙ্গ বটে, অতএব উহাদেরও উত্তমরূপ পরিচালনা দ্বারা সংস্কার সঞ্চয় না করিলে অবশ্যই মন ক্ষীণাবস্থাপন্ন হইবে। তাহা হইলে ঐ সকল প্রবৃত্তিরও পরিচালনা করিতে হইবে কি? না, কারণ ঐ সকল প্রবৃত্তি বা শক্তি মনের অঙ্গ স্বরূপ হইলেও উহা শরীরের অঙ্গ গলগণ্ড, শীলী পদাদির (গোদ) ন্যায় অতিরিক্ত অঙ্গ—উহা মনের ব্যাধিবিশেষের মধ্যে গণ্য সুতরাং ঐ সকল শক্তির বিকাশ ও পরিচালনা দ্বারা আত্মার ব্যাধিযুক্ত অঙ্গই উন্নত হইবে। যে সকল গুণের বিকাশ ও পরিচালনা দ্বারা শরীরের অযথা ক্ষয় হয়, সেই সকল প্রবৃত্তির পরিচালনায় আত্মার বলিষ্ঠত হইয়া

জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় ইহা নিতান্ত অসম্ভবপর কথা। সকলেই অবগত আছেন যে শোক বৃত্তির পরিচালনা দ্বারা শরীর ক্ষীণ হয়, এমন কি ঐ বৃত্তি অতিশয় প্রবল হইলে মৃত্যুও হইয়া থাকে। এখন কি শোককে জীবনীশক্তির বৃদ্ধিকর বলিতে হইবে? ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতিও শোকজাতীয় প্রবৃত্তি। উহারাও শরীরে শোকের ন্যায় ফলসাধন করিয়া থাকে। ক্রোধ যদিও শোকজাতীয় নহে, তথাপি উহা শরীরের ক্ষয়কারক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তখন স্নায়ুমণ্ডলকে অপ্রকৃতিস্থ এবং ফুস্ফুস্ হৃৎপিণ্ডাদির অতিশয় চাঞ্চল্য উপস্থিত করিয়া রক্তরাশিকে অতিশয় উত্তপ্ত ও তরল করিয়া ফেলে, যেন দেহমধ্যে এক প্রকার মহাপ্রলয়ের ঝঞ্ঝাবায়ু উপস্থিত করে। এবং ঐ সকল অধর্ম্ম গুণ বিকাশ দ্বারা মনের অকর্ম্মণ্যতাই সম্পাদিত হয়। অতএব ঐ সকল প্রবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা জীবনীশক্তির বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, ক্ষয়ই হইয়া থাকে।

আরও; সূক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে, শোক, ঈর্ষা, অসূয়া ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তি সকল পৃথক্ কোন প্রবৃত্তি নহে, বাস্তবিক উহারা অভিমান বাসনা ও আশা প্রভৃতির অতি বৃদ্ধির ফল মাত্র। অভিমান অতি ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তি। একমাত্র অভিমান বৃত্তি দেদীপ্যমান থাকিলে বিবেকাদি কোন প্রবৃত্তিই বিকাশের অবকাশ পায় না। এজন্য এক অভিমানকে খর্ব্ব করিয়া যদি আত্মার সমস্ত অঙ্গের সম্পূর্ণতা করা যায় তবে তাহাই কর্ত্তব্য ও হিতজনক। কিন্তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনাকালে শরীরের অতি সুপ্রসন্ন ভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন শরীর যন্ত্রের কিছু মাত্র উত্তেজনা বা ক্ষয় হয় না, তখন অতি শান্ত ও গম্ভীর ভাব দৃষ্ট হয়।

ধর্ম্মের অভাবে আয়ুঃক্ষয় ও উন্নতিতে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি।

ইতিহাসাদি পাঠ করিলে জানা যায় যে, ঋষিগণ অত্যন্ত দীর্ঘায়ু ছিলেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারাও দেখিতে পাই যাঁহারা এক্ষণকার যোগী তাঁহারাও দীর্ঘায়ু, শুধু তাঁহারা নহেন জীবনে যাঁহারা অধিক পরিমাণে ধর্ম্মানুশীলন করিয়া থাকেন তাঁহারাও অধিক দিন জীবিত থাকেন। ইহা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সম্ভব যে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উত্তেজনায় আয়ুর বৃদ্ধি ও তদভাবে

আয়ুর ক্ষয়। এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে সচরাচর দেখা যায় অনেক অনেক অধার্ম্মিক লোকওত অধিককাল জীবিত থাকে। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদি তাহারা ধর্ম্মানুশীলনে জীবন ব্যয়িত করিত তাহা হইলে আরও অধিককাল জীবিত থাকিত। নিম্নে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্, পাকস্থালী, যকৃৎ, পেষী প্রভৃতি শরীর যন্ত্র সমূহের কার্য্যকরী ক্ষমতার নাম আয়ু। আত্মার জৈবনিক বল অনুসারে প্রত্যেক শরীর যন্ত্রের কার্য্যকরী—শক্তি, সময়, ক্রিয়া সংখ্যা ও ক্রিয়ার পরিমাণ দ্বারা নিয়মিত। অর্থাৎ মনে করুন, যদি রামদাসের ফুস্‌ফুস্ যেরূপ বেগ দিলে নিশ্বাস বায়ু নাসিকারন্ধ্র পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে ১২ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয় সেইরূপ বেগে ১ মিনিটে ১৮ বার করিয়া ক্রিয়া করে তাহা হইলে রামদাসের আত্মার জৈবনিক বল অনুসারে ঐ ফুস্‌ফুসের ৭২ বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্য-করীশক্তি থাকিবে। এই প্রকার সকল যন্ত্রেরই কার্য্যকরী শক্তি নিয়মিত। এখন ভাবুন, যদি রামদাস যাহাতে বিতস্তির অধিক দুই অঙ্গুলী দূর পর্য্যন্ত নিশ্বাস-বায়ু প্রসারিত হইতে পারে, এইরূপ বেগ দিয়া তাহার ফুস্‌ফুস্‌কে প্রতি মিনিটে ২১ বার করিয়া কার্য্য করাইতে পারে, তাহা হইলে রামদাসের ৬ ভাগের ১ ভাগ (১২ বৎসর) আয়ু কমিবে। অর্থাৎ ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত উহার ফুস্‌ফুসের কার্য্যকরী ক্ষমতা থাকিবে। আবার যদি, যাহাতে বিতস্তির ২ অঙ্গুলী কম দূর পর্য্যন্ত বায়ু প্রসারিত হইতে পারে সেইরূপ বেগ দিয়া মিনিটে ১৫ বার করিয়া ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া করিতে পারে, তাহা হইলে রামদাসের ১২ বৎসর আয়ু বৃদ্ধি হইবে। অর্থাৎ ৮৪ বৎসর পর্য্যন্ত উহার ফুস্‌ফুসের কার্য্যকরী শক্তি থাকিবে। এইরূপ সমস্ত যন্ত্রেরই সম্ভবে। পরিমাণ অপেক্ষা অধিক ক্রিয়া হইলে সমস্ত যন্ত্রের শক্তিই শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যায় আবার পরিমাণের অপেক্ষা অল্প ক্রিয়া করিলে সকল যন্ত্রের শক্তিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে। তাহা হইলেই দীর্ঘায়ু হওয়া যায়।

পাতঞ্জল দর্শনের তৃতীয় পাদের "সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম" এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস এই মর্ম্ম ব্যক্ত করিয়াছেন ;—"আয়ু-

র্বিপাকং কর্ম্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং নিরুপক্রমং। তত্র যথাদ্রবস্ত্রং বিতা-
নিতং লঘীয়সা কালেন শুষ্যেৎ তথা সোপক্রমং। যথাচ তদেব সম্পিণ্ডিতং চিরেণ সংশুষ্যেৎ এবং নিরুপক্রমং। যথা বাগ্নিঃ শুষ্ককক্ষে মুক্তোবাতেন সমং ততো যুক্তঃ ক্ষেপীয়সা কালেন দহেত্তথা সোপক্রমং যথা বা সঞবাগ্নিস্তৃণরাশৌ ক্রমশোবয়বেষু ন্যস্তশ্চিরেণ দহেৎ তথা নিরুপক্রমং ইত্যাদি” ইহার সার মর্ম্ম।—যে শক্তি হইতে আয়ু শক্তির বিকাশ হয় তাহা দ্বিবিধ ঃ—সোপক্রম আর নিরুপক্রম। যাহার কার্য্য, শরীরের উপর অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহা সোপক্রম, তাহার সত্বরই ক্ষয় হইবে। আর যাহার কার্য্য অল্পে ২ শরীরের উপর প্রকাশিত হইতেছে তাহার নাম নিরুপক্রম, তাহার ক্ষয়ে অনেক বিলম্ব হয়।

এখন দেখা যাউক ধর্ম্মের বিকাশও পরিচালনা না হইলে কিরূপে আয়ুর ক্ষয় হয়। ধর্ম্মশক্তিগুলি যে উর্দ্ধ স্রোতস্বিনী আর অধর্ম্ম শক্তিগুলি অধঃস্রোতস্বিনী তাহা আমরা ‘ধর্ম্মের গতিপ্রণালী’ ব্যাখ্যান্তে বুঝাইয়াছি। এখন কেবল এইমাত্র বলিলেই হইবে যে উর্দ্ধস্রোতস্বিনী আর অধঃস্রোতস্বিনী প্রবৃত্তির উত্তেজনা কালীন শরীরের কি অবস্থা হয়।

মন যখন ভগবানের প্রেমরসে নিমগ্ন হয়, কিম্বা ভক্তিবৃত্তির উদ্দীপনা দ্বারা সেই অমৃতময়ের অভিমুখে অগ্রসর হয়, অথবা পরম বিদ্যার বিকাশ দ্বারা মনস্তত্ত্ব এবং আত্মতত্ত্বাদির অনুভব করত শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য উপলব্ধি করে, অধ্যাত্মজগতে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধি, চিত্ত, অভিমান, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান এবং ইন্দ্রিয়শক্তি প্রভৃতি তত্ত্ব সকল জাজ্জ্বল্যমান উপলব্ধি করিতে থাকে, তখন স্থুল শরীরের ক্রিয়া নিরুদ্ধপ্রায় হয়; মস্তিষ্ক, ফুসফুস্, হৃৎপিণ্ড, পেষী প্রভৃতির ক্রিয়া তখন অতীব মৃদু হইয়া পড়ে। কারণ, ধর্ম্মশক্তি মাত্রেই নিরোধশক্তি হইতে উৎপন্ন এবং অধর্ম্মশক্তি বা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আর ফুসফুস্ হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া মাত্রেই ব্যুত্থানশক্তি হইতে সমুৎপন্ন। নিরোধশক্তি নিবর্ত্তক এবং ব্যুত্থানশক্তি প্রবর্ত্তক। সুতরাং এক সময়ে এই নিবর্ত্তক আর প্রবর্ত্তক উভয় শক্তির কার্য্য হইতে পারে না। যখন শরীরের

ক্রিয়া শক্তি কমিয়া আইসে তখন শরীরের তাপ ও তড়িৎ নিতান্ত অল্প হইয়া আইসে *। যতপ্রকার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আছে সকলেরই উদ্দীপনা কালে শারীরিক ক্রিয়ার মন্দতা হয় এবং তাপ তড়িতের হ্রাস হয়, শরীর শীতবীর্য্য হয়। অন্ততঃ প্রতিদিন দুই তিন ঘণ্টা কাল ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা ক্রমে যখন ঐ সকল প্রবৃত্তির সংস্কার দৃঢ়তররূপে মনে নিবদ্ধ হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত সংস্কার দ্বারা সকল অবস্থাতেই বিবেক, বৈরাগ্য ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতির কিছু কিছু-স্ফুরণ মনে থাকে, স্মৃতরাং প্রায় সর্ব্বদাই শারীরিক ক্রিয়ার প্রভাব কিছু কম থাকে। স্নায়ুমণ্ডল একটু ধৈর্য্যশালী হয়, তাপ, তড়িৎ কিছু কম হয়, শরীর বেশ শীতবীর্য্য থাকে, সুতরাং আয়ুর বৃদ্ধি হয়।

আবার যদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিপরীতে সর্ব্বদাই কেবল চক্ষু কর্ণাদি ঐন্দ্রিয়িক পরিচালনাতেই ব্যাপৃত থাকে তবে তদ্দ্বারা, ভাটিজলে নাবিক পরিচালিতনৌকার ন্যায়, ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য যন্ত্র সকলের বেগ আরও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র যন্ত্র মমুহের কার্য্যকারী শক্তির হ্রাস হয়,—আয়ুর ক্ষয় হয়। মনে করুন, গবাশ্বাদি পশুগণের ইন্দ্রিয়শক্তি অত্যন্ত প্রবলা। উহারা সর্ব্বদাই অত্যন্ত প্রবল ভাবে কেবল অধঃস্রোতস্বিনী বৃত্তির পরিচালনা করে। এই নিমিত্ত উহাদের শরীর যন্ত্রের কার্য্যকারী শক্তি শীঘ্র পীঘ্র উন্নত, শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিষ্ট ও শীঘ্র শীঘ্র চরিতার্থ হইয়া শীঘ্র শীঘ্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এ নিমিত্ত পশুরা এত বলবান্ হইয়াও অল্পায়ু। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে যদি শরীরযন্ত্র সকল অল্প কায করাইলেই আয়ুর বৃদ্ধি হয়, তবে নিদ্রাদ্বারা অধিক সময় নষ্ট করিলে কিম্বা কোন কার্য্য না করিয়া কেবল বসিয়া থাকিলেও কি দীর্ঘজীবী হওয়া যায়? যদি তাহা হয় তবে নিদ্রালু অলস ও বৃথাভিমানী ধনী লোকেরই দীর্ঘায়ু হইত, এবং পূর্ব্বে যে, শারীরিক যন্ত্রের উপযুক্ত পরিচালনায় পুষ্টি ও সুদৃঢ়তা দ্বারা আত্মার পুষ্টি ও জীবনী শক্তিবৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে তাহাও মিথ্যা হয়।

* এই রূপে তাপ তড়িৎ কমিলে যে কোন অপকার হয় না তাহা উপাসনা প্রণালীতে বুঝাইব।

একটু চিন্তা করিলেই ইহার মীমাংসা করিতে পারেন। আমরা কেবল এই মাত্র বলিয়াছি যে, ধর্ম্মশক্তি অভ্যাস দ্বারা সমস্ত শরীর যন্ত্রের মূলবেগ কিছু কম হয়। মূলবেগ কম হইলে যে শারীর যন্ত্রের উপযুক্ত পরিচালনা হয় না তাহা নহে। মূলবেগের অনুসারে সকলগুলি শরীর যন্ত্রের সমভাবে পরিচালনা করার নামই উপযুক্ত পরিচালনা। তাহা দ্বারাই শরীরের অবয়ব সকল উত্তমরূপে সন্নিবেশ ও সুদৃঢ় হইতে পারে। যদি আন্তরিক বেগ বলবান্ সত্ত্বে যন্ত্র সকল অল্প অল্প পরিচালিত হয় তাহা হইলেই শরীরের অকর্ম্মণ্যতা হয়।

অলসাদির আন্তরিক বেগ যেমন তেমনই থাকে, কিন্তু বাহিরে ক্রিয়া কম হয় এবং ক্রিয়ার সমতাও থাকে না। তাহাদের ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া প্রায় যেমন হবার তেমনিই হয়, কেবল হস্ত পদাদির বহিঃ পেশীগুলি সামান্য পরিচালিত হয়। এইরূপ ব্যবহারে আয়ুর ক্ষয় ভিন্ন বৃদ্ধির আশা নাই। ইহাতে মেদ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া শরীর শীঘ্রই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়। অনিয়মিত নিদ্রা দ্বারাও শরীরের ক্ষয় ও পুষ্টির সামঞ্জস্য থাকে না, সুতরাং তদ্দ্বারা আয়ুর ক্ষয়ই হইয়া থাকে। ধর্ম্ম বিকাশ কালে এইরূপ অবস্থা হয় না।

ধর্ম্মক্ষয়ে ভারতবাসীর আরও অধিক আয়ুক্ষয়ের সম্ভাবনা।

সাধারণতঃ ভারতবাসীর শারিরীক প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ দেশে স্নায়ুমৎ প্রকৃতিরই প্রবলতা। স্নায়ুমৎ প্রকৃতির গুণ এই যে, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু মণ্ডল অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল হয় সুতরাং সমস্ত শারীরিক যন্ত্রই অধিকতর চঞ্চল হয়। শরীরাভ্যন্তরে তাপ ও তড়িৎ কিছু অধিক পরিমাণ থাকে। অতএব অন্য দেশীয় লোক অপেক্ষায় এ দেশীয় লোকের শীঘ্র শীঘ্র শরীর যন্ত্রের ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা। এ জন্যই অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতের লোক, বিশেষতঃ বাঙ্গালার (বাঙ্গালার আরও অধিক স্নায়ুমৎ প্রকৃতির প্রবলতা) স্বভাবতই অল্প দিন জীবিত থাকে। এ অবস্থায় ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শরীরটী কিছু শীতবীর্য্য ও যন্ত্রগুলির কিছু ধৈর্য্য সাধন

না করিলে যে শীঘ্র শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, তাহা বোধ হয় অসন্দিগ্ধ।

ধর্ম্মানুষ্ঠান থাকিলে শরীর নির্ব্ব্যাধি ও সচ্ছন্দভাবে থাকে।

শরীর তত্ত্ববিৎ মাত্রেই, বোধ হয় ইহা স্বীকার করিবেন যে, যতক্ষণ আমাদের সকলগুলি শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার সামঞ্জস্য (ক) থাকে, যতক্ষণ সকলগুলি যন্ত্র সমভাবে ক্রিয়া করে; অর্থাৎ যে যন্ত্রের যেরূপ ক্রিয়ার নিয়ম আছে সেই নিয়ম হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া কোন যন্ত্র অধিক বেগে, কোনটী অল্পবেগে কার্য্য না করে; আর যতক্ষণ তাপ ও তড়িতের সামঞ্জস্যের বাধা না হয়;—অর্থাৎ যে যন্ত্রে যে পরিমাণে তাপ তড়িৎ থাকা আবশ্যক সেরূপ না থাকিয়া কোন স্থানে তদপেক্ষা অধিক আর কোন স্থানে অপেক্ষাকৃত কম এরূপ না হয়; ততক্ষণ কোন প্রকার ব্যাধি হইতে পারে না। কিন্তু যখন ইহার বিপরীত অবস্থা হয়, অর্থাৎ শরীর ক্রিয়ার সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইয়া কোন যন্ত্রের ক্রিয়া অধিক ও কোনটীর ক্রিয়া অল্প পরিমাণে হয়, অথবা কোন যন্ত্রের তাপ তড়িতের বৃদ্ধি বা কোন যন্ত্রের তাপ তড়িতের হ্রাস হয়, তখন নিশ্চয়ই রোগ জন্মে। এবং যখন শরীরকে উল্লিখিত সামঞ্জস্যে আনয়ন করা যায় তখনই শান্তি (ঔষধ দ্বারা কেবল এই সামঞ্জস্য ব্যতীত আর কিছুই করা হয় না)। কিন্তু যদি সকল যন্ত্রেরই ক্রিয়া এক পরিমাণে কমে, এক পরিমাণে বাড়ে, এবং তাপ তড়িৎও সকল স্থানেই এক পরিমাণে হ্রাস ও বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে কোন ব্যাধির আশঙ্কা নাই।

এখন দেখা যাউক কিরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শরীর নির্ব্ব্যাধি থাকে। এখানে আর একটি কথা মনে করা আবশ্যক। শরীর যন্ত্রের নিয়মিত কার্য্য করিতে যেরূপ আত্মার যত্ন বা প্রেরণা বিশেষের আবশ্যক তেমন অনিয়মিত কার্য্যেও আত্ম-প্রেরণার প্রয়োজন; শরীরের কোন যন্ত্রের ক্রিয়ায় ন্যূনাতিরেক হওয়া বা কোনখানে তাপ, তড়িতের ইতরবিশেষ হওয়া অথবা কোন ব্যাধিকালে শরীরে যে ক্রিয়া হয় তাহার কোনটিই আত্মার প্রেরণও যত্ন বিশেষের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না।

(ক) Harmony.

এখন ভাবুন, আত্মা যখন বাহ্যজ্ঞান ভুলিয়া ভগবানের ভক্তিরসে নিমগ্ন হয়, অথবা বিবেক-বৈরাগ্যাদি-ধর্ম্মের বিকাশে পরমাত্মায় বিলীনপ্রায় হয়, তখন শরীরের সহিত আত্মার আমিত্ব-সম্বন্ধ শিথিল হইয়া আসে, এমন কি ভক্তি বিবেকাদির চরমাবস্থায় আত্মা শরীরের মধ্যে থাকিয়াও শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে থাকে। সুতরাং তখন আত্মার কোন প্রকার যত্ন বা প্রেরণা শরীরের উপর থাকে না, এজন্য তখন ফুস্‌ফুস্ হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া একবারে নিরুদ্ধ হয়। বিশেষতঃ নিরোধশক্তি আর ব্যুত্থানশক্তি পরস্পরের বিরোধিনী। সুতরাং যতক্ষণ নিরোধ শক্তির কার্য্য হয়, ততক্ষণ ব্যুত্থান শক্তির কার্য্য হইতে পারে না, এবং যে পরিমাণে নিরোধ শক্তির বিকাশ সেই পরিমাণেই ব্যুত্থান শক্তির হ্রাস হয়। (শারিরীক ক্রিয়া সকল যে ব্যুত্থান শক্তির কার্য্য আর বিবেকাদি যে নিরোধ শক্তির কার্য্য তাহা পূর্ব্বেই (ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণ ও বর্ণনা প্রকরণে) সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে)। সুতরাং বিবেকাদি স্ফুরণ হইলেই শারীরিক ক্রিয়া ক্রমে নিস্তেজ হইতে থাকে (ইহা প্রত্যক্ষেই দেখা যায়)। যখন ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া নিস্তব্ধ প্রায় হয় তখন তাপ আর তড়িৎও নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সুতরাং তখন সমস্ত শরীর যন্ত্রেরই ক্রিয়ার ন্যূনাতিরেক না থাকিয়া সামঞ্জস্য হয়; এবং তাপ তড়িতেরও সামঞ্জস্য হয়। এই সময়ে ব্যাধি থাকিলেও শরীর নির্ব্ব্যাধি হয়। পরে যখন জাগ্রৎ অবস্থা হয়, তখনও ঐরূপ সমতা হইতেই শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার পুনরারম্ভ এবং তাপ তড়িতের নূতন স্ফুরণ হইতে থাকে। এ নিমিত্ত পরেও উহার সামঞ্জস্যই থাকে। অহোরাত্র মধ্যে অন্ততঃ তিনবার এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে শারীরিক ক্রিয়া ও তাপ তড়িতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইতে পারে না সুতরাং কোন ব্যাধি হইবারই অবকাশ থাকে না। আর যদিও কদাচিৎ কোন পীড়া হয়, তখনও ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উহার প্রতিকার হইতে পারে। যত প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে তাহাদিগের প্রত্যেকের দ্বারা এই উপকারটী ন্যূনাধিক ক্রমে কিছু কিছু সংসাধিত হইবে সন্দেহ নাই। প্রত্যক্ষেও দেখা যায় যে ধর্ম্মশীল ও ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মারা বড় পীড়িত হন না। এরূপ বহুতর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, একটী গ্রাম কিম্বা সহর

ম্যালেরিয়া, মহামারী, বসন্ত প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া একবারে উৎসন্ন গেল, কিন্তু সেই গ্রামে সেই স্থানে একজন ব্রহ্মচারী কি পরিব্রাজক অক্লেশে নির্ব্ব্যাধি ও সবল শরীরে সমস্ত রোগকে তুচ্ছ করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেছেন। ইহাপেক্ষা আর প্রবলতম প্রমাণ কি হইতে পারে?

ধর্ম্ম ব্যতীত প্রকৃত সুখ হয় না।

আমরা মোহান্ধ হইয়া যে ইন্দ্রিয়গণের নিকট প্রকৃত সুখের প্রার্থনা করি, তাহারা কি আমাদিগকে সেই প্রকৃত সুখ আনীয়া দিতে পারে? সেই ইন্দ্রিয়গণ কি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে? যেখান হইতে ইন্দ্রিয়গণ সুখ আহরণে চেষ্টিত তাহা কি—সেই রস-গন্ধ স্পর্শাদিবিষয় সকল কি প্রকৃত সুখের স্থান? কখনই না। যদি বিষয় দ্বারা প্রকৃত সুখ—প্রকৃত তৃপ্তি হইত তবে আত্মার হাহাকার থাকিবে কেন? নয়নাদি ইন্দ্রিয়গণ দেখিতে দেখিতে শুনিতে শুনিতে তাহা হইতে ফিরিয়া আসে কেন? সেই সুস্বাদু-রস, সেই সুস্নিগ্ধরূপ, সেই কোকিলকুলের কাকলী যেন ঘৃণা পূর্ব্বক উপেক্ষা করিয়া আবার বিষয়ান্তরের নিমিত্ত ব্যাকুল হয় কেন? যদি বিষয়ই প্রকৃত সুখের স্থান হইত তবে ইন্দ্রিয়গণ কদাচ তাহা উপেক্ষা করিতে পারিত না, কদাচ তবে নিত্য নূতন পাইবার জন্য লালায়িত, উৎকণ্ঠিত হইত না। তাই বলি ইন্দ্রিয়গণ প্রকৃত সুখ আহরণ করিতে সমর্থ নয়। যে সুখের আস্বাদ করিলে মনের আর অরুচি হয় না—যে সুখ পাইলে মন উপেক্ষা করিতে চায় না তাহারই নাম প্রকৃত সুখ। একমাত্র ধর্ম্মই সেই প্রকৃত সুখের আকর—সেই প্রকৃত সুখের ভাণ্ডার। যখন ভক্তি ও বিবেকাদির উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা উদ্বেলিত হইয়া আত্মাকে প্লাবিত করিয়া ফেলে, তখন আত্মা অমৃত সাগরে ভাসিয়া ভাসিয়া অমৃত পানে উন্মত্ত হয়, তখন আত্মার অন্তরে আনন্দ বাহিরে আনন্দ আনন্দের বাজার আনন্দের হাট। সেই বাজারে না গেলে, সেই আনন্দ সেই শান্তি বুঝা যায় না। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, যে আনন্দের আস্বাদে পৃথিবীপতিও সাম্রাজ্যসুখ বিস্মৃত হইয়া গহনবাসী হয়েন তাহা যে সাম্রাজ্য সুখ অপেক্ষায় অধিক, সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মের দ্বারাই জাতীয়তা ও সমাজ রক্ষা।

যাহাতে মনুষ্য সমাজ মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সহানুভূতি অভিব্যক্ত হয় তাহারই নাম জাতীয়তা। সেই জাতীয়তা জন্মাইয়া দেয় এমন কতকগুলি কারণ আছে। যত পরিমাণে পরস্পরের কার্য্যকলাপ, আহার ব্যবহার, রীতিনীতি, প্রভৃতি একভাবাপন্ন হইবে তত পরিমাণে জাতীয়তার বৃদ্ধি পাইবে। ইহা স্বীকার্য্য যে ধর্ম্মহীন স্বেচ্ছাচার রাজ্যে উক্ত কার্য্যকলাপ ও আহার ব্যবহারাদির ঐকমত্য হওয়া কদাচ সম্ভবে না। কারণ জগতে দুই জন মনুষ্যের রুচি এক প্রকার দৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রুচি। কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠান হইলে রুচির পার্থক্য সত্ত্বেও কার্য্যকলাপাদির একত্ব হইতে পারে এবং সেইরূপ কার্য্য করিতে করিতে পরিণামে রুচি এবং প্রকৃতিও কার্য্যানুযায়ী হইয়া উঠে। কারণ প্রকৃত ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে যে যে আচার ও আহারাদির আবশ্যক হয় তাহা নিয়মিত ও নির্দ্দিষ্ট। সন্ধ্যা, আহ্নিক, জপ, স্নান, দান, অতিথি সংকার, উৎসব, তীর্থযাত্রা, শৌচকার্য্যের অনুষ্ঠান, গোসেবা, সাধু ব্রাহ্মণ সেবা, দেবতা ভক্তি, ভগবদুপাসনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারাই ধর্ম্মের রক্ষা ও উন্নতি হয়। কাল্পনিক ধর্ম্ম ভিন্ন প্রকৃত ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে এই কার্য্যগুলির অনুষ্ঠান ব্যতীত আর কোনই উপায়ের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ধর্ম্মানুশীলন করিতে গেলেই অগত্যা সকলেরই একরূপ কার্য্যকলাপ করিতে হয়। এবং ধর্ম্মের উন্নতি দ্বারা ক্রমে মানসিক প্রকৃতিরও একতা হইয়া পড়ে, তখন প্রকৃত জাতীয়তা সংস্থাপিত হয়, তখন পরস্পরের নিমিত্ত পরস্পরের সহানুভূতি, সকলেই সকলের সুখে সুখী সকলেই সকলের দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মই একমাত্র জাতীয়তার ভিত্তি, ধর্ম্মই সকলকে এক সূত্রে বন্ধন করিবার আলান স্বরূপ। ধর্ম্মশীল মহাত্মার অন্যায় স্বার্থপরতাদি দোষ থাকিতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্ম দ্বারা সমাজেরও রক্ষা। অন্যায় স্বার্থপরতা আর অবিশ্বাস এই দুইটীই সমাজের প্রবলতর শত্রু। এই দুটী না থাকিলেই দণ্ডদম্য পশুর ন্যায় সমাজকে রাজদণ্ডে পীড়িত হইতে হয় না, নিরর্থক অর্থ ব্যয়ে দারিদ্র হইতেও হয় না।

ধর্ম্মের ক্ষয়ে পরকালের ক্লেশ।

ধর্ম্মের ক্ষয় হইলে ইহকালে যে সকল গুরুতর অনিষ্ট হয়, তাহাই এ পুস্তকে দর্শিত হইল। বাস্তবিক আরও যে কত অনিষ্ট তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা নিতান্ত অসম্ভব ও অসাধ্য। ইতঃপর এই দেহ ত্যাগ করিলে আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়া অতি গুরুতর ভয়ানক যাতনা ভোগ করিতে হয়। তৎপর আবার নানা প্রকার নীচ যোনিতে বারম্বার জন্মগ্রহণ করিয়া অসঙ্খ্য দুঃসহ ও দুর্নিবার্য্য দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আপাততঃ সে বিষয়ে হস্তার্পণ করিলাম না; "পুনর্জন্ম" প্রকরণে এই সমস্ত বিষয় অতি বিস্তারিতরূপে যুক্তি দ্বারা পরিদর্শিত হইবে।

ধর্ম্মোন্নতির গুরুতর ফল।

এ পর্য্যন্ত কেবল নাস্তিকদের প্রবোধের নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের শারীরিক ও সামাজিক ফল মাত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক উহা ধান্যার্থী কৃষকের ধান্যফলের সঙ্গে সঙ্গে পল খড় লাভের সদৃশ অকিঞ্চিৎকর ফল মাত্র। ধর্ম্মের গুরুতর ফল সমস্তই অব্যাখ্যাত রহিয়াছে। তাহা উপাসনাদি প্রবন্ধে ক্রমে বিস্তারিতরূপে পরিদর্শিত হইবে। এইক্ষণ কেবল প্রতিজ্ঞা স্বরূপ বলিতেছি যে ধর্ম্মের পরম উন্নতি হইলে অণিমা লঘিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের স্ফুরণ হয়, ধর্ম্মেরই পরম উন্নতি হইলে মনুষ্যের ঈশ্বরত্ব লাভ, ব্রহ্মত্ব লাভ এবং অবশেষে সমস্ত দুঃখ শোক তাপাদি হইতে পরিত্রাণ হইয়া মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা ধর্ম্মের চরম উন্নতি না করিয়া অনেকটা উন্নতি করিতে পারেন তাঁহাদেরও নানা প্রকার মহাশক্তির বিকাশ হয় এবং মৃত্যুর পর পরম সুখের উপভোগ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মগণ আতিবাহিক দেহবান্ হইয়া কেহ বা চন্দ্রলোকে কেহ বা সূর্য্যলোকে কেহ বা অন্যান্য লোকে অবস্থিতি করত অপরিমিত আনন্দভোগ করিয়া থাকেন। বহুকাল ঐরূপ স্বর্গীয় সুখভোগ করিয়া পরে আবার অত্যুন্নত মহাত্মার গৃহে জন্মগ্রহণানন্তর অতিশয় উচ্চমনাঃ মহাত্মা ধর্ম্মাত্মা হইয়া পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করেন। এই সকল বিষয় ক্রমে সাধ্যমত বিবরণে প্রবৃত্ত হইতেছি। ওঁ শ্রীসদাশিবঃ শরণম্ ওঁ।

ইতি শ্রীশশধর কৃতায়াঞ্চ ধর্ম্মব্যাখ্যায়াং ধর্ম্মপ্রয়োজনং
নাম প্রথম খণ্ডং সম্পূর্ণম্।